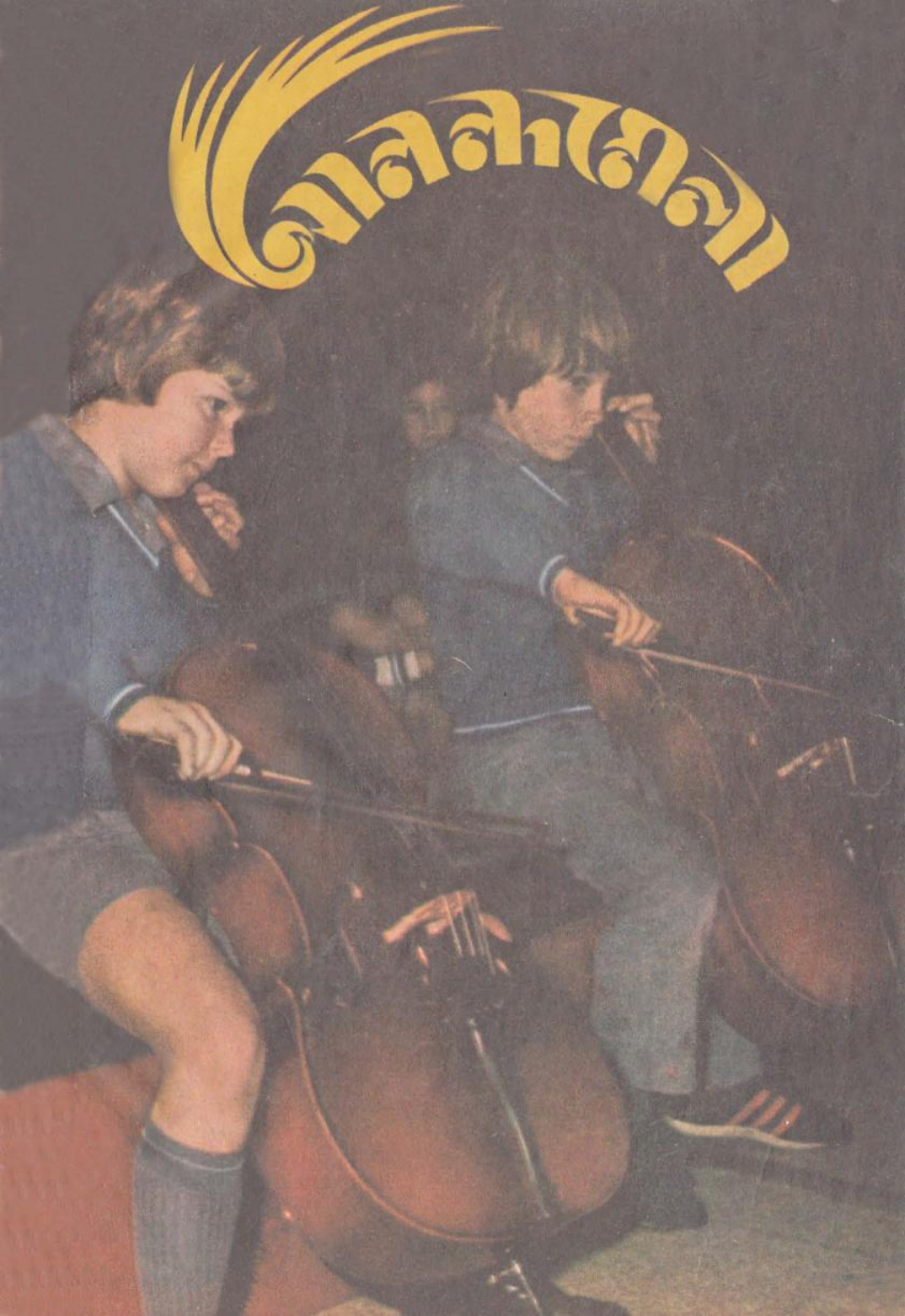

জন্মদিনের উপহার

UCO/CAS-77/80-BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

আনন্দমেলা

২০ আশ্বিন ১৩৮৮ • ৭ অক্টোবর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৩ সংখ্যা

ছড়া

জেলেডিঙি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৯
পড়ব কখন। ধীরেন করগুপ্ত ৫১
পুজোর ছুটি। রাখাল বিশ্বাস ৫৫

গল্প

রাজকীয় ম্যাচ। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ৮
আলোর চোখ। শ্যামলকুমার মল্লিক ১৫
ভিতু ভূত। সমর মিত্র ৫৩

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৩
সিসের আঙটি। বিমল কর ৫৭

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৯

বিশেষ রচনা

সিনকোনা। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
মেলভিলে শিশু-উৎসব। অহিভূষণ মালিক ৩৬

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৪৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

অ্যাশেজ ইংল্যাণ্ডেরই। অশোক রায় ৪২
জাহিরের কীর্তি। মণীশ মৌলিক ৪৫
ব্রিয়ারলি ও বথামের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ১৩, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ: মেলভিল শিশু-উৎসবের একটি দৃশ্য

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়া জখম অতীব যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

HTP-BCL-5641

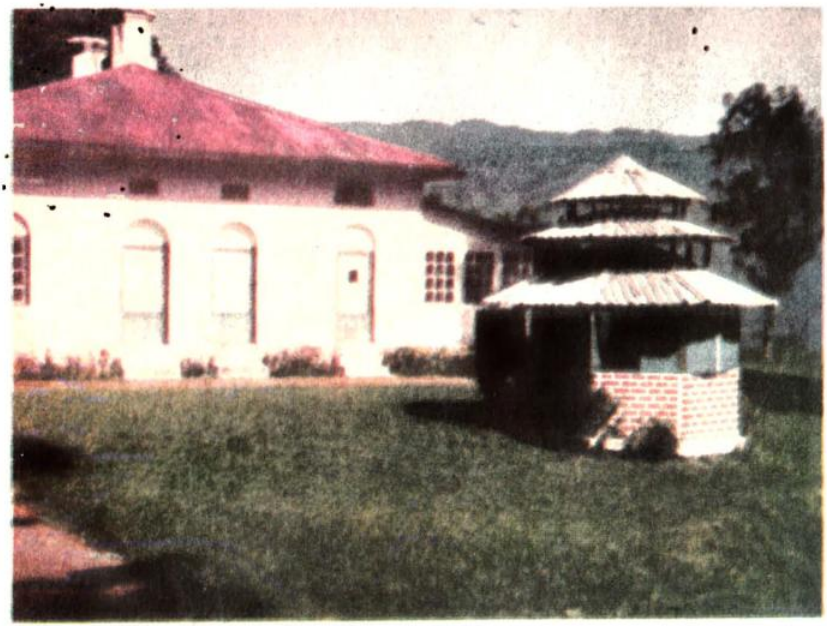

মংপুর এই বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ডান দিকের কাচের ঘরে বসে লিখতেন

সিন্‌কোনা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়িটা তখন পাক খেতে খেতে পাহাড়ের ওপরে উঠছিল। মাঝবয়সী নেপালি ড্রাইভার হঠাৎই আমার দিকে চেয়ে ডান হাত গাড়ির বাইরে বের করে কিছু-একটা দেখতে বলল ইশারায়। ডানদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢালে ছড়ানো-ছিটোনো রঙিন বাড়ি আর রাস্তার ধারে-ধারে লাল-সবুজ পাতাওলা গাছ। কী গাছ ওগুলো? পাতাবাহার? প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম, ওই গাছগুলোই সিন্‌কোনা। পরে সময়মতো একটা পাতা দাঁতে কেটেছিলাম। কষ-কষ, তেতো!

গিয়েছিলাম মংপুতে। উদ্দেশ্য ছিল সিন্‌কোনার চাষ দেখা। সিন্‌কোনা জানো তো? এই গাছেরই ছাল, শেকড় থেকে বেরিয়ে আসে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন।

ছোট-ছোট মাপের সিন্‌কোনা গাছগুলো কয়েক হাত দূর থেকে এক ঝলক দেখলে পাতাবাহার বলে মনে হতেই পারে। চেহারায় ঠিক তিন বছরের কলমি আমগাছের মতো। আমের মতোই লম্বাটে পাতা। ফারাক শুধু রঙে। লাল আর সবুজ রঙ আধা-আধা। কঞ্চির মতো সরু-সরু ডালে শির-বের-করা পাতা।

দারজিলিং জেলার মংপু, মানসং, রংপো আর লাটপানচারের বিভিন্ন পাহাড়ে সিন্‌কোনার চাষ চলছে অনেক বছর ধরে। একশো-বাইশ বছর আগে ব্রেজিল থেকে মারখান সাহেবের আনা সিন্‌কোনা বীজ ম্যাকআইভর যখন উটাকামণ্ডে লাগিয়েছিলেন তখনও দারজিলিংয়ের পাথুরে মাটি কিন্তু জানত না একে বুকে গেঁথেই তার দিন কাটবে, রাত কাটবে। একষট্টি সালে ব্রিটেনের 'কিউ'-এর রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে কিছু বীজ কলকাতায় এনে শিবপুর বোটানিকসে লাগানো হল। দুদিন পরেই কিন্তু বোঝা গেল এ মাটি সিন্‌কোনাকে পালন করবে না। সিন্‌কোনা এই

দেশে স্থায়ী ঘর পেয়েছিল তার দুবছর পর। আঠারোশো-তেষট্টিতে দারজিলিংয়ে বীজ ফেললেন অ্যাণ্ডারসন সাহেব। তরতর করে বেড়ে উঠল গাছ পাহাড়ি জলহাওয়ায়। অ্যাণ্ডারসনই শুরু করলেন সিন্‌কোনার ঢালাও চাষ এই পাথুরে জেলায়। মংপু হল হেড কোয়ার্টার্স।

এরপর মংপু থেকে সিন্‌কোনা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে এই জেলার অন্যত্র। উনিশশো সালে মানসং, আটত্রিশে রংপো আর তেতাল্লিশে লাটপানচার। এই চার বাগিচায় সিন্‌কোনা এখন ত্রিশ হাজার একর জমির মালিক।

সিন্‌কোনার সর্বাঙ্গে কুইনিন। ছালে রয়েছে সবচেয়ে বেশি—সাড়ে তিন থেকে চার শতাংশ। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই কুইনিন বের করা হয়। কারখানাটিও মংপুতে। সিন্‌কোনা যদি শিল্প হয়, তাহলে ওই শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। তা ছাড়া চারটি বাগিচায় টেক্‌নিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল, রিসার্চ স্কলার মিলিয়ে রয়েছেন আরও শ-সাতেক মানুষ।

সিন্‌কোনার চাষ কেমন করে হয় বলি। বীজ থেকেই এই গাছের জন্ম। প্রথমে খামারের বিশেষ মাটিতে বীজতলা তৈরি হয়। বীজতলা থেকে ছোট-ছোট দেড়-দু ইঞ্চির মতো চারা গজালে সেখান থেকে তা তুলে আর এক জায়গায় রুইতে হয়। ধান রোয়া দেখেছ তো? প্রায় সেই রকমই। এইভাবে বছর-খানেক থাকার পরে গাছগুলো যখন একফুটের মতো লম্বা হয় তখন সেগুলো পোঁতা হয় বাগিচায়। বাগিচা বলতে বিভিন্ন পাহাড়ের ঢালে।

শিশুদের যেমন সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়, কিশোর সিন্‌কোনাকেও তেমনি না আগলালে চলে না। ঝড়, জল, চড়া রোদের তাত থেকে এইসময় ছোট-ছোট সিন্‌কোনা গাছকে যারা বাঁচায়, আগলিয়ে রাখে, তাদের বলা হয় শেড-ট্রী। শেড-ট্রী হচ্ছে বড়-বড় গাছ। যে-কোনও বড় মাপের পাহাড়ি গাছই শেড-ট্রী হতে পারে। এইসব গাছ সিন্‌কোনাকে বড় হতে সাহায্য করে, আবার পাহাড়ের মাটিকেও ধরে রাখে। ধস্ আটকায়।

চার বছর পর সিন্‌কোনা যখন একটু বড় হয় তখন তার ট্রিমিং চলে। অর্থাৎ ডালপালা কিছু-কিছু ছাঁটা হয়। সেইসব ছাঁটা ডালপালা চলে যায় কারখানায়। ছাল ছাড়িয়ে তার থেকে বের হয় কুইনিন। তারপর সিন্‌কোনার আট বছর বয়স হলে মাটির ওপরের গোটা গাছটিকে

সিন্‌কোনার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-3760R

রিসার্চ ল্যাবরেটরি। ভেষজ গবেষণা-কেন্দ্র

কেটে ফেলা হয়। গাছের গুঁড়ি এবং শিকড়বাকড়গুলো অবশ্য ঠিকই থাকে। সেখান থেকেই আবার গাছ গজায়, বড় হয়। আরও চার বছর পরে যখন মূল সিন্‌কোনার বয়স হয় বারো তখন আবার সেই প্রথমবারের মতো ট্রিমিং। আর ষোলো বছর বয়স হলে মাটি খুঁড়ে একেবারে শেকড়সুদ্ধ সিন্‌কোনা গাছটিকে উপড়ে ফেলা হয়। সেখান থেকে কারখানা। একটা গাছে তিনভাগের একভাগ কুইনিন থাকে কিন্তু ওই শেকড়েই।

এক সময় কুইনিনই ছিল ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ। তারপর একটা সময় আসে যখন সারা পৃথিবী জুড়েই সিন্‌থেটিক ড্রাগ অর্থাৎ কৃত্রিম ওষুধের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। সেটা এই শতকের পঞ্চান্ন থেকে সত্তর সালের ঘটনা। তখন সিন্‌কোনার চাহিদা গেল কমে। ফলে যা হবার তাই-ই হল। চাষ-কমল, উৎপাদন কমল। তবে কয়েক বছরেই সেই ধাক্কাটা সামলে ওঠা গেল। কৃত্রিম ওষুধের নানারকম খারাপ দিক দেখা দিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে। ফলে আবার কদর হল সিন্‌কোনার। চাহিদাও বাড়ল। সত্তরের পর থেকে আবার নতুন উদ্যমে চাষ হতে লাগল। বাড়তেও থাকল হু-হু করে। পঁচাত্তর সালে নতুন ডিরেকটর হয়ে এলেন ডঃ সলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি অন্য নানা ধরনের ভেষজ গাছগাছড়ার চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা নিলেন। এই ধরনের দুটি গাছ হচ্ছে ইপিকাক এবং ডায়সকোরিয়া।

সিন্‌কোনায় যেমন কুইনিন, ইপিকাক থেকে তেমন বের করা হয় এমিটিন। এই এমিটিন প্রধানত আমাশয় রোগের ওষুধের বেস ড্রাগ। ইদানীং যক্ষ্মা রোগের ওষুধেও এমিটিন লাগছে খুব। তাছাড়া এমিটিন রঙ শিল্পের ক্যাটালিস্ট হিসেবেও কাজ করে। আর ডায়সকোরিয়া থেকে তৈরি হয় ডায়সজেনিন। এটি হচ্ছে হরমোনাল স্টেরয়েড।

মংপুর পরিচিতি হয়তো সিন্‌কোনারই খাতিরে। কিন্তু মংপুকে বিখ্যাত করেছেন কে বলো তো? আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মংপু গেছেন চার-চারবার। প্রথমবার ১৯৩৮-এর একুশে মে আর শেষবার ১৯৪০-এর একুশে এপ্রিল।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। লাল-ঢালা বাড়ির পশ্চিমে বিশাল এক পাম। তার পাশেই ক্যামেলিয়া গাছ। দোতলার বসার ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্যামেলিয়ার 'মোমের ফুল' দেখতেন।

চুপিচুপি এখন একটা সত্যি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ না থাকলে শুধুমাত্র সিন্‌কোনা আর কুইনিনে মংপু হয়তো আমার কাছে তেতোই থেকে যেত চিরটাকাল।

রাজকীয় ম্যাচ

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

কলকাতায় যখন বোমা পড়েছিল, যে-ঘটনাকে আমাদের হাতিবাগানের মেজদা গর্বের সঙ্গে ক্যালকাটা বম্বিং বলে উল্লেখ করত, সেই উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে যাঁরা কলকাতা ছেড়ে আমাদের পাহাড়-অরণ্য-ঘেরা ছোট্ট আধা-শহরটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ইভাদি আর মেজদার কথাই আমাদের মনে আছে। ইভাদি আমাদের রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়েছিলেন। প্রায়ই ডেকে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাতেন। আর মেজদা শহর-কলকাতার সঙ্গে আমাদের একটা কাল্পনিক পরিচয় ঘটিয়েছিল। এ-কারণে আমরা ওকে হাতিবাগানের মেজদা আখ্যা দিয়েছিলাম।

আমাদের আধা-শহরটি ছোট হলেও লাক্ষা ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। নানান সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল সেখানে। কিন্তু জীবনযাত্রা ছিল মন্থর। পালপার্বণে, বিশেষত কালীপুজোয় কলকাতার যাত্রা আসত। আসর মাত করে দিতেন ছোট ফণী আর বড় ফণী। তার রেশ বহুদিন পর্যন্ত আমাদের চোখে স্বপ্নের কাজলের মত লেগে থাকত। এছাড়া আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বড়-একটা ছিল না। কিন্তু ফুটবলের কদর ছিল খুব। শহরের প্রতিটি মানুষই ফুটবল-অনুরাগী ছিলেন। আশপাশের শীল্ড-টুর্নামেন্টের খেলায় আমাদের টীম খেলতে যেত।

হাতিবাগানের মেজদা আমাদের শহরে আসার অতি অল্পকালের মধ্যেই চালিয়াতচন্দর নাম কিনেছিল। আমরা সর্বদাই ওকে জব্দ করার ফিকির খুঁজতাম।

সেবার নন্দলাল শীল্ডের সেমি-ফাইনাল খেলা পড়ল সাতগ্রাম কুমার ইলেভেন বনাম আমাদের টীমের। খেলার দিন আমাদের টীমের সেনটার ফরওয়ার্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল। টীম ম্যানেজার ধীরেনদা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মেজদাকে নেহাত নাকাল করবার জন্য বললাম,

"রঞ্জুদার বদলে মেজদাকে নাও-না ধীরেনদা, ও তো ভাল খেলে।"

ধীরেনদা বললেন, "কে মেজদা?"

বিল্টু বলল, "হাতিবাগানের মেজদা। শুনেছি কলকাতার নামকরা দলে খেলে।"

ধীরেনদা বললেন, "তোরা বলছিস?"

বিল্টু বলল, "তুমি খেলিয়েই দ্যাখো-না।"

বিল্টু লেফট উইং-এ খেলত। ধীরেনদার বিশেষ প্রিয় পাত্র। ধীরেনদা বললেন, "ঠিক আছে। ওকে খবর দে।"

আমরা জানতাম আজ মেজদার কপালে দুর্ভোগ আছে। কারণ, কুমার ইলেভেন সাতগ্রামের রাজাবাহাদুরের নিজস্ব টীম। দু' নম্বর, মেজকুমার লালবাবু নিজেই গোলে খেলেন। ইনি নাকি দারুণ খামখেয়ালি। তিন নম্বর, সাতগ্রামের দর্শকরাও সমান বদমেজাজি এবং ওদের মাঠে খেলার একমাত্র নিয়ম হল বাইরের কোনো টীম সাতগ্রামের টীমকে হারিয়ে যেতে পারবে না। নিজেরা হারতে যদি না-ও পারে, নিদেনপক্ষে ড্র পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু তার বেশি নৈব নৈব চ। তাহলে প্রাণ নিয়ে ফেরার নিশ্চয়তা নেই।

মেজদাকে বলতেই সে রাজি। সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টস-কিট থেকে বেরোল হোস, অ্যাংক্লেট, নীকাপ, বুট। হাজার হোক, গোষ্ঠ পাল, আমাদের আশীর্বাদধন্য খেলোয়াড় আমাদের মেজদা।

লরিতে চড়ে দুপুরবেলা মাইল-তিরিশের রাস্তা হাঁকড়ে সাতগ্রাম পৌঁছুলাম। সাতগ্রামের রাস্তায় যেন রথের মেলার ভিড়। কাতারে-কাতারে মানুষ চলেছে খেলা দেখতে।

রাজবাড়ির গেস্ট হাউসে আমাদের থাকবার জায়গা। খাওয়া-দাওয়া, আদর-আপ্যায়নের ঢালাও আয়োজন। রাশি-রাশি চপ, শিঙাড়া, ফল, মিষ্টি। যে যত পারো খাও। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ভোজনপটু মেজদা যখন আলতো হাতে একটা আপেল মাত্র তুলে নিল, তখন আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "এ কী মেজদা, তুমি খাচ্ছ না কেন?"

মেজদা দাঁত কিড়মিড় করে চাপা স্বরে বলল, "এই কি খাবার সময়, পেটুক কোথাকার! আমাদের শহরের ইজ্জতটা আমাদের হাতের মুঠোয়। একটু আলগা করেছ কি ফুড়ুত করে উড়ে যাবে, চড়ুইপাখির মতো।"

আমি তেমনি ফিসফিসিয়ে বললাম, "কিন্তু খাবে তো মুখে, মুঠো আলগা করার দরকার কী?"

বিল্টু ওর স্বভাবসিদ্ধ হিন্দির জলে ভেজানো ভাঙা বাংলায় বলল, "খাওয়ার সঙ্গে ইজ্জতের ক্যা মতলব মেজদা?"

মেজদা চটে গিয়ে বলল, "তোমরা বুঝবে না কক্সকম্ব কোথাকার। ফুটবল খেলা শুধু পায়েরই খেলা নয়। মাথারও খেলা।"

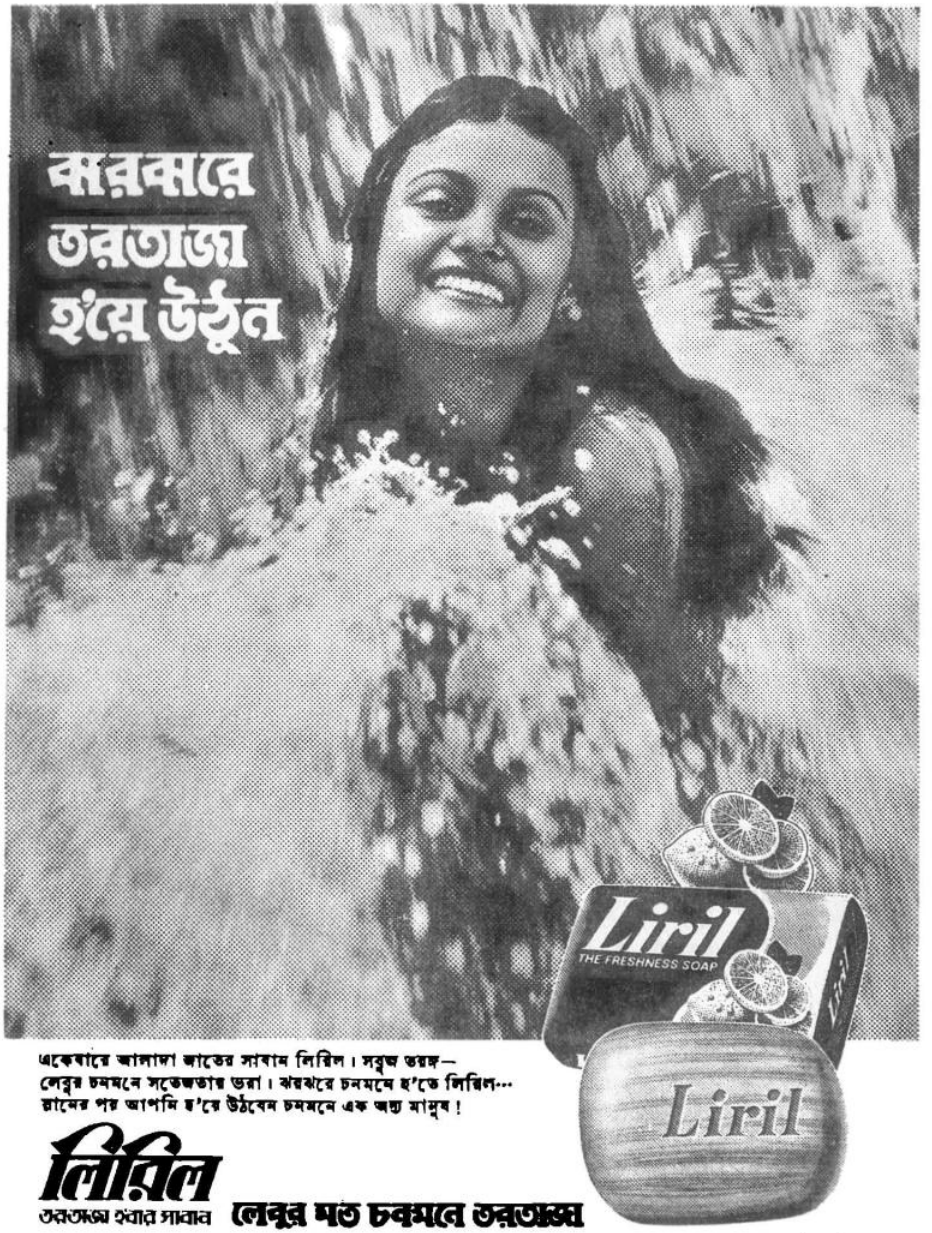

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চমমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চমমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চমমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চমমনে তরতাজা

লিনটাস-LR.38-203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বিল্টু বলল, "সহি বাত। এ তো সবাই জানে। পা দিয়ে শট মারি। মাথা দিয়ে হেড করি।"

মেজদা বলল, "মাথা মানে হেড নয় জাদু, ব্রেন। বুঝলে—ব্রেন।"

আমি বললাম, "তা তো বুঝলাম মেজদা, কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে খেলার কী সম্পর্ক বুঝলাম না।"

মেজদা কানে-কানে বলল, প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করতে নেই। যদি খাবারের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে দিয়ে থাকে? কিংবা ঘুমের ওষুধ?"

শেষ পর্যন্ত কিছুতেই খাওয়ানো গেল না মেজদাকে। খেলার আগে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে নানা কায়দায় দুমড়ে মুচড়ে ওয়ার্ম-আপ করল মেজদা।

খেলা শুরু হল। ওদের গোলে খেলছিলেন লালবাবু। কুমড়োপটাশের মতো ভারী শরীর। পেটের বেড় গুড়ের নাগরির মতো। কিন্তু দুর্ধর্ষ খেলছিলেন লালবাবু। একটা মাছিরও যেন সাধ্য নেই লালবাবুর হাতকে ফাঁকি দিয়ে গলে যাবার। হাতে যেন চুম্বক লাগানো আছে। বলতে গেলে, সেদিনকার মাঠের প্রধান খেলোয়াড় লালবাবু আর আমাদের মেজদা। বিল্টু মেজদাকে বলের যোগান দিয়ে যাচ্ছিল, আর মেজদা ওদের ব্যাক, হাফব্যাককে কাটিয়ে সরাসরি গোলে ধাঁই ধাঁই শট করছিল আর লালবাবু টপাটপ ধরে ফেলছিলেন। ওদিকে দর্শকদের আসন থেকে মুহুর্মুহু করতালি।

অঘটনটা ঘটল হাফটাইমের মিনিট-পাঁচেক আগে। যেই বিল্টু মাঠের কোণ থেকে একটা বল সেন্টার করে মেজদার পায়ে এগিয়ে দিয়েছে অমনি মেজদা বাঁ পা দিয়ে বলটাকে চেপে প্রচণ্ড জোরে মাটি ঘেঁষে একটা শট মারলেন গোলে। এবং কী আশ্চর্য, বলটা লালবাবুর হাতখানেক দূর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে ঢুকে গেল। লালবাবু অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কারণ, বডি থ্রো করার ক্ষমতা ওঁর নেই। রেফারী গোলের হুইসেল দিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন সব-কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে যারা চেঁচাচ্ছিল তাদের হাঁ বন্ধ হল না। যে হাততালি দেবার জন্য হাত তুলেছিল তার হাতে আর তালি বাজল না। সিনেমার ফ্রীজ শটের মতো অবস্থা। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল সবাই। এ কী অঘটন! সাতগ্রামের টীমকে গোল দেওয়া? তাও সাতগ্রামের মাঠেই? দর্শককুল উত্তেজিত। খেলোয়াড়রা নিজের নিজের জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। লালবাবু থপ থপ করতে করতে এগিয়ে এলেন। মেজদাকে বললেন, "তুই আমাকে ঘাসকাটা শট মেরে গোল দিলি। হিম্মত থাকে তো উঁচুতে শট মেরে গোল দে। এই রাখলাম বল। পঞ্চাশটা শট মার, দেখি কতগুলো গোল দিতে পারিস।" লালবাবু এগিয়ে এসে পেনালটি সীমানার মধ্যে বল রাখলেন।

মেজদার অবস্থা তখন কাহিল। পঞ্চাশটা শট করা মানে পায়ের দফা রফা। তবু মেজদাকে দাঁড়াতে হল এবং পঞ্চাশটি শট মারতে হল। লালবাবু একা একটি বল ধরেন আর চেঁচিয়ে ওঠেন, এক, দুই—এইভাবে পঞ্চাশটি মারার পর পরিত্রাণ পেল মেজদা। তার মধ্যে উনপঞ্চাশটি বল ধরেছেন লালবাবু। একটি মাত্র গোল হয়েছে। মেজদা তখন ধুঁকছে।

এ-রকম একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে দর্শকরা কিছুটা শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। আমরা ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। তেমনি এলাহি ব্যবস্থা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শুনলাম গোল দেওয়ার অপরাধে রাজা-বাহাদুরের দরবারে বিচার হবে আজই রাত্রে। ধীরেনদা বললেন, "তোকে বললাম, গোল দেওয়ার নিয়ম নেই। নিদেন পক্ষে ড্র, তুই বেমক্কা একটা গোল ঠুকে দিলি?"

কাঁদো-কাঁদো স্বরে মেজদা বলল, "তুমি তো ড্র করবার কথা বলেছিলে। গোললেস ড্র তো বলনি। আমি ভেবেছিলাম পরে ওদের একটা চান্স দেব আমাদের দিকে গোল দেবার। যদি না পারে, নিজেই সেমসাইড গোল দিয়ে দেবখন। তা টাইম দিলে কই।"

"এখন সামলাও ঠেলা!" ধীরেনদা বলল, "এদের শাস্তি দেওয়ার নাকি অদ্ভুত সব রীতি। শুনেছি ওই পাহাড়ে চাটানের ওপর থেকে গড়িয়ে দেয় দু'হাজার ফুট নীচে।"

বিল্টু বলল, "শুনেছি নাক আর কান দুটো

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

কেটে গলায় মেডেলের মতো ঝুলিয়ে দেয়।"

মেজদা ঠকঠক করে কাঁপছিল ভয়ে। কারণ নাক কান খোয়া যাওয়ার ভয়টা ওরই। অবশেষে সন্ধের পর ডাক পড়ল। বিরাট হলঘর। দেওয়ালে আরশি লাগানো। ছাদের ওপরে থেকে ঝোলানো এক বিশাল ঝাড়লণ্ঠন। কোত্থেকে যেন লুচি ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে।

মেজদা সেই গন্ধে ছোঁক-ছোঁক করে বলল, "লুচি ভাজার গন্ধ আসছে, না রে ঘণ্টা? খাঁটি গাওয়া ঘি বোধহয়?"

আমি বললাম, "বলির পাঁঠাকে হাড়িকাঠে চড়ানোর আগে ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে নেয়। বোধকরি তারই ব্যবস্থা।"

মেজদা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। পাশের ঘরটাই বোধহয় দরবার-কক্ষ। দুজন বরকন্দাজ আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম, ও হরি, দরবার কোথায়, এ তো এক বিরাট ডাইনিং-হল। মস্ত বড় ডাইনিং টেবল ঘিরে বিশ-পঁচিশটা চেয়ার। ওদিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন রাজাবাহাদুর স্বয়ং। আমরা দুরুদুরু বক্ষে চেয়ারে বসলাম। একজন বেয়ারা রুপোর ট্রেতে কী যেন নিয়ে এল।

মেজদা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ওই ট্রেতে কী আছে রে ঘণ্টা? নাক-কান কাটার ছুরি নয় তো?"

তখনই জলদগম্ভীর কণ্ঠে রাজাবাহাদুর বললেন, "আজ সাতগ্রাম টীমকে কে গোল দিয়েছ এগিয়ে এসো।"

মেজদা কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাদুরের কাছে এগিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর ট্রে থেকে একটা সোনার মেডেল তুলে মেজদার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "লালবাবুকে গোল দিয়েছ, তুমি সত্যিই বাহাদুর।"

মেজদার মুখে হাসি ফুটল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লালবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছেন।

রাজাবাহাদুরের বিলিতি গাড়িতে চড়ে মাঝ রাতে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরলাম। ফেরার পথে সোনার মেডেলটা হাতে দোলাতে দোলাতে মেজদা বলল, "একেই বলে রাজকীয় আপ্যায়ন। রাজোচিত ব্যবহার।"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবির মজা

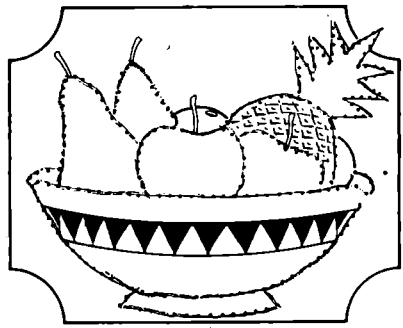

বিন্দুগুলিকে পরপর জুড়লেই মস্ত বাটিতে অনেক ফল পাবে। তারপর রঙ-পেনসিল বুলিয়ে ফলগুলিকে ঠিকমতো রঙিন করো।

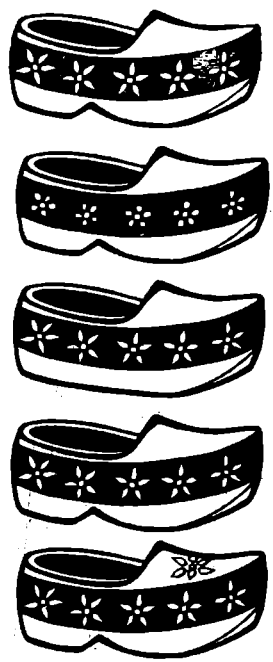

কাঠের জুতোর সবগুলি কি একইরকম? ভাল করে দেখে তারপর উত্তর দাও।

(না, নীচের জুতোয় একটা বাড়তি ফুলের নকশা রয়েছে।)

প্রস্তুত হ'ল

নতুন

প্রেস্টীজ

100% সুরক্ষিত

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার!

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন-কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

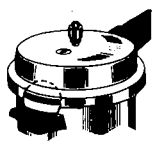

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ! এর অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট-ফুট অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকৃজিলিয়ারী হ্যাণ্ডেল'—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝক্‌ঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

TTK উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

আলোর চোখ

শ্যামলকুমার মল্লিক

লেখক একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-অফিসার। তাঁর এই বিবরণের স্থান-কাল-পাত্র কাল্পনিক হলেও ঘটনাটি মূলত সত্য। নানা অসাধু পন্থায় এ-দেশের বহু মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ বিদেশে পাচার হয়; তেমনি একটি পন্থার তিনি এখানে হদিস দিয়েছেন।

দেওয়ালের যেমন কান আছে, আলোরও তেমনি চোখ আছে।

পালাম এয়ারপোর্টে ভি আই পি লাউঞ্জের সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক-বন্ধুদের সঙ্গে খোশগল্প করছিলুম। বিদায়ী অক্টোবরের সকাল। রোদ্দুর যতই কড়া হচ্ছে ততই মিঠে লাগছে। চীফ্ অব প্রোটোকল একবার মাঠে ঘুরে-ফিরে অপেক্ষমাণ কূটনীতিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য-বিনিময় করে আবার লাউঞ্জের দিকে পা বাড়ালেন। শোনা গেল, মন্ত্রিসভার একটি জরুরি মীটিং-এ ব্যস্ত থাকায় কোনো পূর্ণ-মন্ত্রী আসতে পারছেন না, মাননীয় বিদেশী অতিথি ও তাঁর পত্নীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে আসছেন একজন মহিলা-উপমন্ত্রী। সাংবাদিক-বন্ধুরা উৎকর্ণ হয়ে ঘোষণাটি শুনলেন আর নিজেদের মধ্যে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে বুঝে নিলেন প্রোটোকলের কোনো নড়চড় হল কিনা— মানে নিউজ হল কিনা! তাঁদের মধ্যে কেতাদুরস্ত এক বন্ধু নিস্পৃহভাবে এগিয়ে এলেন আমার দিকে, পায়ের কাছে একটা পটে চমৎকার কারনেশন ফুটেছিল— সেদিকে নজর যেতেই ঝুঁকে পড়লেন। একটা বেশ বড়গোছের টকটকে কারনেশন তুলে সেটি আমার ধূসর রঙের জ্যাকেটের বাট্‌ন্-হোলে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "যাক, তাহলে অতিথি-পত্নীর কল্যাণে পুরনো দিল্লির সব পুরনো বইয়েরই সদ্‌গতি হয়ে গেল।" তারপর নিউইয়র্কগামী প্লেনটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখছেন মশাই, কতগুলো ভারী-ভারী ক্রেট্ উঠছে প্লেনে!"

আমি মৃদু হেসে বললুম, "তাই তো দেখছি।" কিন্তু মুহূর্তে কথার মোড় ফিরিয়ে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, "কী বিশাল কারনেশন।"

প্লেন ছাড়তে আর মিনিট পনরো বাকি। প্রোটোকল-চীফকে আবার বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। উপমন্ত্রী এসে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে এসেছে ন'ইঞ্চি দীর্ঘ একটি নীল রঙের ভেলভেটের বাক্স। লিফ্‌টে উঠে তিনি লাউঞ্জে চললেন, আমরাও কেউ-কেউ তাঁর অনুসরণ করলাম। অতিথি দুজনের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে উপমন্ত্রী অপরাধীর মতো আমতা-আমতা করে প্রায় তাঁদের কানে-কানে বলতে শুরু করলেন, "আপনারা তো আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের মাননীয় অতিথি। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিবৃত্ত আপনাদের অজানা নয়। বারবার বৈদেশিক আক্রমণের ঢেউ এসে আমাদের অনেক অমূল্য গ্রন্থ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আবার ইউরোপের কোনো-এক বিশেষ দেশের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত পাঠোদ্ধার করার জন্য সুপ্রাচীন অথর্ব-বেদের অনেক পাণ্ডুলিপি আমাদের দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি আর ফিরে আসেনি। তাই পুরাণ-ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও আমরা আর বাইরে যেতে দিই না। আশা করি আপনারা ঐ দুর্লভ গ্রন্থের পেটি দুটির জন্য আমাদের আর অনুরোধ করবেন না। তার মধ্যে কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে যেতে পারে। এ নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র পীড়াপীড়ি করলে আমাদের সরকার বিশেষ বিব্রত বোধ করবেন।" সবশেষে প্রধান অতিথিকে উদ্দেশ করে বললেন, "তাছাড়া আপনি শুধু আমাদের মাননীয় অতিথিই নন, এ-দেশে ও-দেশে আপনার বিস্তর সুনাম।"

অতিথিপত্নী বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "কই, আমরা তো কোনো পাণ্ডুলিপি কিনিনি! শুধু পুরনো বইয়ের দোকানে ছাপার হরফে..."

তাঁর কথাগুলি শেষ হবার আগেই তাঁর করমর্দন করে প্রবীণা উপমন্ত্রী ভেলভেটের কাস্‌কেটটি দেখিয়ে বললেন, "আপনার জন্যে এই ব্যক্তিগত উপহারটি এনেছি, আপনার পছন্দ হলে খুব খুশি হব।"

তরুণী অতিথিপত্নী সাগ্রহে সেটি খুলে দেখলেন, ভারী সুন্দর একটি জয়পুরী জেড-এর বুদ্ধমূর্তি। মুহূর্তে তাঁর মুখটি লাল হয়ে উঠল। আনন্দে? না, আনন্দে তো মুখ অতটা রাঙা হয়

না। তাঁর হাত থেকে কার্পেটে পড়ে যাচ্ছিল ছোট মূর্তিটি। উপমন্ত্রী সেটি সামলে নিয়ে মখমলের পেটির মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "দূতাবাসের অনেকেই আপনাদের সম্ভাষণ জানাতে নীচে অপেক্ষা করছেন। চলুন, আমরা এবার নীচে যাই।"

লিফ্‌টে নামবার মুখে প্রধান-অতিথিকে বলতে শুনলাম, "এই দীর্ঘ সপ্তাহব্যাপী সফরে আপনাদের আন্তরিক সৌজন্য আর আতিথেয়তা আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে দিয়েছে।" তারপর থমকে একটু নিচুস্বরে বললেন, "যদি ভুল করে এই সৌজন্যের কোনো অপব্যবহার..."

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এ কী বলছেন আপনি! আপনাদের আগমন যে আমাদের কী আনন্দ আর উৎসাহ দিয়েছে তা বলবার নয়। আপনারা আবার আসবেন এ-দেশে।"

যথাসময়ে বিমানটি তাঁদের নিয়ে উড়ে চলল। উপমন্ত্রী মহোদয়া প্লেনটির দিকে হাত নেড়ে দিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, পেটি দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক-প্রধান ঠিকমতো গোপনে রেখেছেন তো?"

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। সম্রাট হর্ষবর্ধন(৬০৫-৬৪৭ খ্রীস্টাব্দ) কান্যকুব্জে রাজত্ব করছেন। চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ পদব্রজে চীন থেকে সমরখন্দ্ হয়ে ভারতের গান্ধার রাজ্যে এসেছেন(৬৩০ খ্রীস্টাব্দ)— প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সন্ধানে। বুদ্ধদেবের সাধনার এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তিনি দীর্ঘকাল ধরে পরিভ্রমণ করেছেন। পেয়েছেন প্রচুর, দিয়েছেন আরও বেশি। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপি আর তথাগতের স্মারক বহু সম্পদ তিনি চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন, দিয়ে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের এক অপূর্ব রেখালেখ্য— তখনকার ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাস।

সম্রাট অশোকের মতো হর্ষবর্ধনেরও ছিল বৌদ্ধধর্মে গভীর শ্রদ্ধা। হর্ষ তখন হিউ এন সাঙকে নিয়ে প্রয়াগে বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুধর্মের মহাসম্মেলনে মশগুল। গৌড়ের পরাক্রান্ত হিন্দু শাসক শশাঙ্ক বেদবিমুখ বৌদ্ধধর্মের তথাকথিত নাস্তিকতায় অসহিষ্ণু হয়ে একদিন নির্দেশ দিলেন— বুদ্ধগয়ার বোধিতরুটি জ্বালিয়ে দেওয়া হোক।

ঠিক এর আগেই মহাবোধি মঠে স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুটি বুদ্ধমূর্তি খোদাই করেছিলেন জয়পুরের এক বিখ্যাত বৌদ্ধ-ভাস্কর। নিখুঁত তাদের কারিগরি। মস্ত একখণ্ড সবুজ রঙের জেড পাথর কেটে ধ্যানরত বুদ্ধদেবের একটি অপূর্ব প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন তিনি। তার ওজন প্রায় এক মন। বুদ্ধের আরেকটি আবক্ষ বিগ্রহও তিনি উৎকীর্ণ করেছিলেন একটি আধমনি জয়পুরী কালো জেডে। চলতি কথায় জেড বলা হলেও, আসলে জহুরিদের মতে এটি ছিল জয়পুরী অ্যাভেন্‌চুরিন্। হিউ এন সাঙের দেশে জেড্ সবচেয়ে পবিত্র পাথর হিসেবে গণ্য হত। চীনের বিশ্বাস ছিল জেড পরম সৌভাগ্য এনে দেয়।

সে কথা এখন থাক। এই দুটি মূর্তি নিয়ে ভাস্কর যাত্রা করেছিলেন জয়পুর থেকে গয়ার পথে। সঙ্গে ছিল দুই তরুণ সহচর— ভাস্করের দুই ছেলে। ভারতে উচ্চাঙ্গের আসল পান্নারঙা জেড পাওয়া যায় না, তাই পিতার আদেশে ছেলে দুটি নাকি সুদূর বর্মা মুলুকে কাচিন্ পাহাড়ে পাড়ি দিয়েছিল— যেখানে ঐ জেডের জন্মস্থান। নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় দেড় বছর পরে তারা ভাস্করের হাতে তুলে দিয়েছিল একমনি সেরা জেড। শোনা যায়, বেদিন বোধি দাউদাউ করে জ্বলছিল, সেইদিনই নাকি ভাস্কর আর তাঁর দুই সহচরকে গয়ার কাছেপিঠে একটি জলা জায়গায় দেখা গিয়েছিল। তাঁরা কেউ আর ফিরে আসেননি, মূর্তি দুটিও সেই থেকেই উধাও!

মূর্তি দুটি এতই সুন্দর হয়েছিল যে, জয়পুরের অন্যান্য কারিগর সেগুলি গয়ার পথে যাত্রা করার আগেই তাদের ছোটখাটো সংস্করণ(রেপ্লিকা) পাথরের উপর খোদাই করে ফেলেছিল। সেই ঘরানার মূর্তির আধুনিক রূপায়ণ জয়পুরের জহুরি বাজারে খুঁজলে আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তবু আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বা দেশবিদেশের অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু বহু চেষ্টা করেও সেই মূল মূর্তি দুটির হদিস পাননি।

আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পরে দেখা গেল বুদ্ধদেবের সেই শান্তশীল ধ্যানরত মূর্তি দুটি— বৈদেশিক অতিথির কাঠের পেটি দুটির

মধ্যে সমাসীন! চারপাশে মলাটহীন পুরনো সব বইয়ের পাতার ঘেরাটোপ আর তার মধ্যে ফোম আর স্পঞ্জ দিয়ে সযত্নে প্যাক করা!

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, **Murder will out,**— আমরা বলি, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'।

সামান্য একটা হিসেবের ভুলেই এই অমূল্য সম্পদ দুটির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। আমাদের বিদেশী অতিথিরা ভারত হয়ে আমেরিকা সফরে যাচ্ছিলেন। তাদের 'শপিং লিস্ট' ছিল এত বিরাট যে, কিছুতেই ফুরোতে চায় না! সব পেটিগুলিই যেন তাঁদের সঙ্গে একই প্লেনে যায়— এই ছিল অতিথিপত্নীর ব্যক্তিগত অনুরোধ।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগেজের তালিকায় মালপত্রের একটি যথাযথ বিবরণ দেবার প্রথা আছে। **কেননা,** বৈদেশিক ডিপ্লোম্যাটদের ব্যাগেজ খুলে পরীক্ষা করা ভয়ানক রীতিবিরুদ্ধ। তাঁরা যা লিখে দেবেন, সেটিই অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়াই সৌজন্য। ঘোষিত বিবরণে ঐ পেটি দুটিতে 'দুর্লভ গ্রন্থ' ছিল। কাস্টম্‌স্‌-এর এক মধ্যপদস্থ অধিকারীর ব্যক্তিগত তদারকে যখন পেটিকা দুটি ওজন করা হল, তখন তাদের ওজন দেখেই তাঁর চক্ষু স্থির। বই ভারী হয় বটে, কিন্তু কাগজের বই তো পাথরের মতো ভারী হয় না! উঁকি মেরে যে যাচাই করবেন, তারও সুযোগ নেই। মাননীয় অতিথির নামাঙ্কিত নাইলনের ফিতে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে সীলকরা পেটি। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকাশ্য পরীক্ষা নিষিদ্ধ— জেনেভা কন্‌ভেন্‌শন— 'ডিপ্লোম্যাটিক ইম্যুনিটি'। অগত্যা তিনি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ফোরেনসিক বিভাগের শরণাপন্ন হতে কাস্টম্‌স্‌-প্রধানকে সুপারিশ করলেন।

ফোরেনসিক বিভাগের এক উচ্চপদস্থ অধিকারীর সঙ্গে গোপনে জরুরি আলাপ হল। সমস্যা— আধারটি মুক্ত না করেই আধেয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব কিনা! বিশেষত, সময় যেখানে স্বল্প এবং আধারের অধিকারী যখন এতই স্পর্শকাতর।

ফোরেনসিক বিজ্ঞানীরা এলেন। তাঁরা এসেই রন্টজেন সাহেবকে স্মরণ করলেন। এক্স-রে রেডিওগ্রাফি করা হল পেটি দুটির—

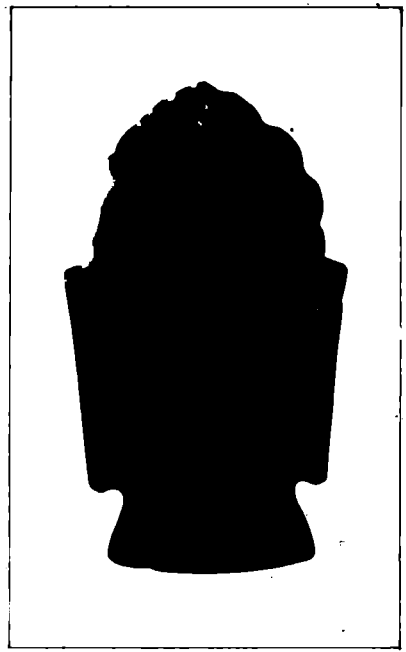

মূর্তি দুটির রেডিওগ্রাফের ছবি

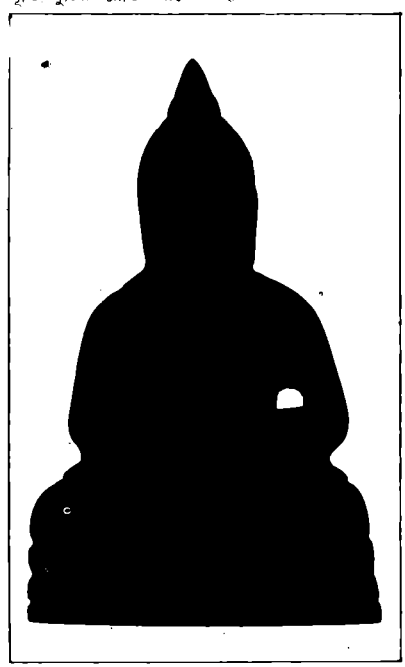

অমনি তাদের পেটের কথা বেরিয়ে এল। মূর্তি দুটির পরিষ্কার 'আউটলাইন' ফুটে উঠল এক্স-রে প্লেটে। শুধু বই থাকলে অন্য ছবি উঠত, কিন্তু শক্ত পাথর থাকায় ধাক্কা খেল এক্স-রে, সেগুলি ভেদ করতে পারল না। সুতরাং খোলাখুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আর কোনো বাধাই রইল না। স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে যাচাই করা হল। ক্রোমিয়মের লাইন ফুটে উঠল স্পেকট্রামে— যা নাকি বর্মার আসল জেডেই পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক-প্রধান এলেন। তাজ্জব ব্যাপার! এগুলি তো সেই সপ্তম শতাব্দীর ভাস্করের অমূল্য সৃষ্টি! নিরেট, মজবুত পান্নারঙের ভারী পাথর— মিহি দানাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। স্বচ্ছ রত্নের উগ্র দ্যুতির তীব্রতায় মূর্তি দুটি চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, একটি স্নিগ্ধ শ্যামল দীপ্তিতে মন ভরিয়ে দেয়!

মহান ঐতিহ্যময় ভারতের মেরুদণ্ড ছিল ধর্ম। আর তাকেই আশ্রয় করে শত শত নিপুণ ভাস্কর যুগে যুগে রচনা করেছেন কত অপরূপ বিগ্রহ। ভারতের প্রত্যেকটি জনপদের প্রতিটি দেবালয় বা তাদের ভগ্নাবশেষ সেই ভাস্কর্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই অমূল্য জাতীয় সম্পদগুলি রক্ষা করার চেতনা বা দায়িত্ববোধ এল মাত্র স্বাধীনতা লাভের পর। তার আগে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আমাদের কত শত দেববিগ্রহ— নটরাজ, বিষ্ণু, পার্বতী, বুদ্ধ— দেশের বাইরে চলে গেছে। তাদের কিছু কিছু দেখা যায় বিদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক-জাদুঘরে। বাকিগুলি কয়েক শতাব্দীর অন্তরালে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রায় হাত-বদল হয়, প্রকাশ্যে বা গোপন নিলামে। শুধু অনন্য কারুকার্যের জন্যই নয়, প্রাচীনত্ব আর দুর্লভতায় এদের মূল্যায়ন হয়। খামখেয়ালি কোটিপতির ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এরা আবার কয়েক শতাব্দী ঘুমিয়ে পড়ে। রণ্টজেন সাহেব বাদ সাধলেন বিগ্রহদের এই অবাধ ভুলপথে চলায়!

কলকাতার ছদ্মবেশ

তোমাদের প্রায়ই কলকাতাকে সুন্দর করে তোলার কথা ভাবতে বলা হয়।

আসলে কিন্তু কথাটা উল্টো। মানুষ নিজে সুন্দর না হ'লে বাইরেটাকে সুন্দর করতে পারে না। এই সুন্দরের অর্থ কিন্তু পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা। মানুষকে অনেক যত্ন করে ছোটবেলা থেকে এই পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হয়। এর সঙ্গে পয়সা থাকা না থাকা, গরীব বড়লোকের কোন সম্পর্ক নেই।

তোমরা যদি কখনও কোন সাঁওতালী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে থাক, তাহ'লে আমার কথার অর্থ বুঝতে পারবে। কি তক্‌তকে ঘরদোর। কেমন ঝকঝকে তাদের শরীর-মন। অথচ এরা কিন্তু প্রায়শই 'দিন আনি দিন খাই' জাতের মানুষ।

তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ চেষ্টা করলে প্রথমে নিজেকে ও নিজের বাড়িটাকে, তারপর পারিপার্শ্বিককে পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলতে পারে। তোমাদের নিজেদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার কথাটা সবার আগে। সকালে উঠেই খুব যত্ন নিয়ে দাঁত মাজতে হয়। বাইরে থেকে বাসায় ফিরে হাত পা মুখ ভালভাবে ধোবে। শহরে রাস্তায় রাস্তায় কত বীজাণু ছড়িয়ে থাকে তা জান তো? নিজেদের পড়ার টেবিল, বইপত্তর গুছিয়ে রাখা, ট্রাম বাসের টিকিট, টুকরো ছেঁড়া কাগজ, বাবাদের দেশলাই-এর কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো বা যাবতীয় ঘরের নোংরা যাতে একটা নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা হয় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। দরকার সকাল আটটার আগে এই নোংরা ফেলার পাত্রটি পাড়ায় জঞ্জাল ফেলার জায়গায় খালি করে আসা। সারাদিন টুকটাক ময়লা ফেলা নয়। দিনে মাত্র একবার। এবং তা সকাল আটটার আগে। আর রবিবার দিন একটু বেশী সময় নিয়ে কানের পিঠ, গোড়ালি, কনুই সব ঘষে সাফ করে স্নান করা। রোজ তো আর অত সময় পাও না।

কলকাতা শহরের এই নোংরা রূপটা একটা ছদ্মবেশ। নোংরাটা মুছে দেবার চেষ্টা করছে অনেক সরকারী বেসরকারী সংস্থা। তোমরাও তাতে কাঠবিড়ালীর আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এস। তার আগে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিককে নোংরামুক্ত করে নাও।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৬ ॥

আমি তাঁর একটা 'কাজ' করতে পারব কিনা এই প্রশ্নের জবাব নানাভাবে দেওয়া যায়। আমি হয়তো বলতে পারতাম, হ্যাঁ, পারব, নিশ্চয়ই পারব। বলুন-না কী করতে হবে? অথবা আমি বলতে পারতাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি। অথবা বলা যেত, আগে কাজটা কী বলুন। না জানলে কী করে বলব? আমি কিন্তু বিশেষ কিছু না বলে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে একটু আলতো মাথা নাড়লাম। রাঙাকাকাবাবু আমার প্রতিক্রিয়াটা নিশ্চয়ই লক্ষ করলেন। বিচলিত না হয়ে একটু সময় নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে গেলেন।

'তুমি কেমন গাড়ি চালাতে পারো?'

আমি কেমন গাড়ি চালাতে পারি এর উত্তর আমার মতো মুখচোরা লাজুক কিশোরের পক্ষে দেওয়া শক্ত। অনেকেই জানতেন যে, আমি ছোট বয়স থেকেই গাড়ি চড়তে ও চালাতে ভালবাসি, প্রায়ই গাড়ি চালাই এবং ভালই চালাই। মা ও বাড়ির অন্যদের আমি এদিক-ওদিক নিয়ে যাই। গাড়ি-চালানোটা আমার কাছে ছিল একটা শখ ও আর্ট। গাড়ির কলকবজা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অল্প এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বেশি উৎসাহ ছিল না। গাড়ির প্রতি আমার এই ঝোঁক দেখে কিছুদিন আগেই বাবা আমার নামে একটা গাড়ি কিনেছিলেন। জার্মান গাড়ি, নাম 'ওয়াণ্ডারার'—যোগ্য নাম বটে। ওয়াণ্ডারার গাড়িটাও যেন আমাকে পছন্দ করত। গাড়িটির গিয়ার-টিয়ারের ব্যবস্থা একটু আলাদা রকমের ছিল। ড্রাইভার বা অন্য কেউ চালালে ওয়াণ্ডারার গোলমাল করত। সেজন্য অন্য লোকের চালানো বাবার পছন্দ হত না, আমি হাতের কাছে থাকলে আমাকেই চালাতে বলতেন। আমার ছবি তোলার শখ দেখে বাবা পরে আমাকে একটার পর একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন। আমি আবার স্বভাবের দোষে একটার পর একটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার প্রতি বাবার এ-ধরনের দুর্বলতা দেখে কেউ-কেউ ঠাট্টা করে—হয়তো বা ঈর্ষার রেশও তার মধ্যে ছিল—আমাকে 'ফেভারিট সান অফ্ শরৎচন্দ্র বোস' বলতেন। আসলে কিন্তু বাবার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চাইনি। যা পেতাম, না চাইতেই পেতাম।

বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা যখন বন্দী, মা ওয়াণ্ডারার গাড়িটি বিক্রি করে দেন। কিনেছিলেন আমাদের রেশ পরিচিত এক বন্ধু।

সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলা

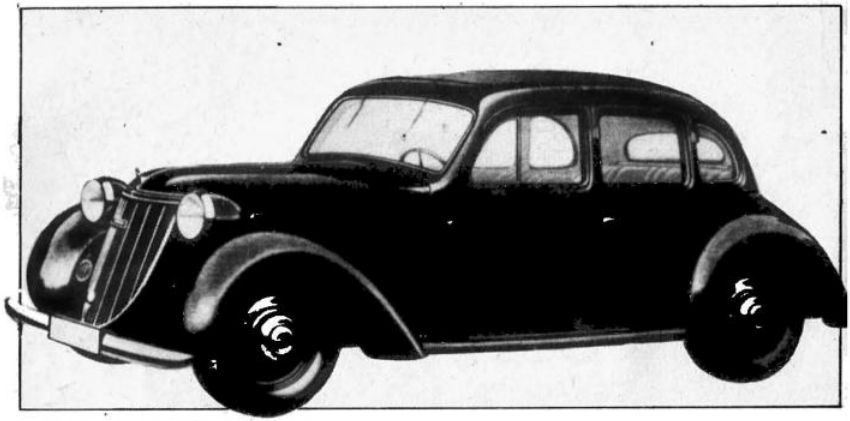

জার্মান ওয়াণ্ডারার গাড়ি

মুক্তি পাবার কিছুদিন পরে বাবার আর্থিক অবস্থা খানিকটা ভাল হলে আমি ঐতিহাসিক কারণে বাবাকে ফের গাড়িটি কিনে নিতে বলি। আবার ওয়াণ্ডারার গাড়ি আমার হেফাজতে ফিরে আসে।

ভাগ্যিস একটা গাড়ি ও ক্যামেরা হাতের কাছে থাকত। তা না হলে অনেক অমূল্য অভিজ্ঞতার স্বাদ আমি জীবনে পেতাম না।

আমি কেমন গাড়ি চালাতে পারি, এর জবাব আমি দিলাম বেশ চাপা গলায় একটু সলজ্জভাবে—এই একরকম ভালই পারি। তার পরেই প্রশ্ন এল—আমি কখনও দূরপাল্লায় গাড়ি চালিয়েছি কি না। জবাবে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, সে-রকম কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি যখন বললাম যে, দূরপাল্লায় গাড়ি আমি চালাইনি, রাঙাকাকাবাবু বিচলিত হলেন বলে মনে হল না।

প্রথম প্রশ্নটি যেন ছিল প্রস্তুতিপর্ব। পরে বুঝতে পারি যে ঐ কথাগুলির মধ্যে পরের ঘটনার মূল প্রশ্নগুলি সবই ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে প্রস্তুত করে নিয়েই তিনি আসল কথাটা পেড়ে ফেললেন। বললেন, একদিন রাত্রে তাঁকে গাড়ি করে বেশ কিছুদূর পৌঁছে দিতে হবে, কেউ কিন্তু জানবে না। 'পারবে?'

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, শেষ প্রশ্নটি নিশ্চয়ই আমার মনে তীব্র শিহরন জাগিয়েছিল কিংবা আমি নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আসলে কিন্তু আমার তেমন কিছু হয়নি। আমার একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা দোষ বলে ধরে নেওয়া যায়, আবার গুণ বলেও। কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বা খবরে—সেটা দুঃখজনক হোক বা আনন্দের হোক—প্রথম পর্যায়ে আমার বাহ্যিক কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। আমি দুঃখে মুষড়ে পড়ি না, আনন্দেও আত্মহারা হই না, বা হঠাৎ উত্তেজিত হই না। ব্যাপারটা যেন মনের গভীরে চলে যায়, বেশ কিছুদিন পরে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া আমি অনুভব করতে আরম্ভ করি। রাঙাকাকাবাবুর আকস্মিক প্রশ্নে আমি শান্তই ছিলাম।

আমি তাঁকে লুকিয়ে গাড়ি করে কোথাও নিয়ে চলে যাব, কেউ জানবে না! ব্যাপারটা বোধহয় আমার মস্তিষ্কে ঠিক ধরেনি। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, যেটা আমি আগে ঠিক পারতাম না। একটু এগোলেন; বললেন, "এ-বাড়িতে কেবল ইলা জানবে।" আরও বললেন, "ইলাকে আমি টেস্ট করে দেখেছি, সে পারবে।"

কিছুদিন পরে ইলাই আমাকে বলল যে, আমার সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং সে আমাকেই কাজের ভার দেওয়াটা সমর্থন করেছিল। এলগিন রোডের বাড়ির খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে ইলার সঙ্গেই আমার সম্পর্কটা ছিল সবচেয়ে নিকট এবং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা

ছিল সহজ। সুতরাং ব্যাপারটা এইভাবে শুরু হওয়াতে আমরা দুজনেই খুশি হয়েছিলাম।

আমাকে সতর্ক করে দিয়ে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, একটা 'ফুল-প্রুফ' প্ল্যান আমাদের তৈরি করতে হবে যাতে কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে। এই সব কথা মাথায় নিয়ে আমি ধীরেসুস্থে বাড়ি ফিরে এলাম। তিনতলায় নিজের ঘরে গিয়ে রাঙাকাকাবাবুর কথাগুলো মনে-মনে নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। বাস্তবিক তিনি কী করতে যাচ্ছেন পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। তবে এটা যে একটা সাধারণ রাজনৈতিক লুকোচুরি নয় সেটা বুঝতে দেরি হল না। আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যেন ব্যাপারটা খুঁটিয়ে ভেবে দেখে একটা প্ল্যান ছকে নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই থেকে শুরু হল রাতের পর রাত গোপনে কথাবার্তা বলা। প্রথম দিনের কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি একটা অসাধ্য সাধন করলেন। আমার মুখচোরা স্বভাব ও আড়ষ্ট ভাব একেবারে দূর করে দিলেন। কী করে করলেন? আমার মনে হয়, তাঁর যে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এটা বুঝিয়ে দিয়ে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুললেন। একই উপায়ে দেশে ও বিদেশে তিনি কত লোকের আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন এবং আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের দিয়ে বড় বড় কাজ করিয়েছেন। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে এমন খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করি যে, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের এই নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গেও আমার আচরণের ধরনটা বদলে গেল। বাবার সঙ্গেও আমি নানা বিষয়ে খুব খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা ও মতবিনিময় আরম্ভ করলাম। যে-কাজে আমি জড়িয়ে পড়লাম, বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হতে না পারলে সে-কাজ করা সম্ভব ছিল না।

লুকিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার প্ল্যান ছাড়াও অন্য কতরকম প্রশ্নও আমার মাথায় ভিড় করে এল। প্রথমত আমি ভাবলাম, আমাকে রাঙাকাকাবাবু ডাকলেন কেন? আমার চেয়ে ভাল গাড়ি চালাতে পারে ও মোটরগাড়ির কলকবজা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—এমন লোক

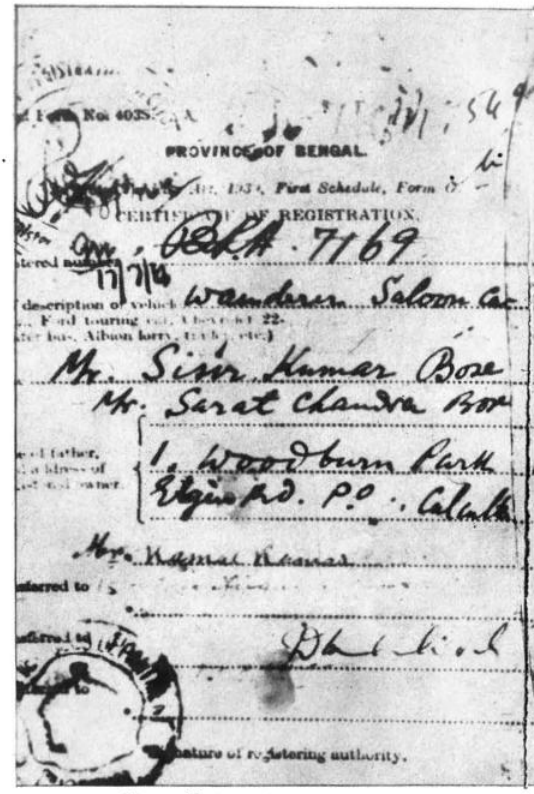

ওয়াণ্ডারার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন-বইয়ের প্রথম পাতা

তো পরিবারের মধ্যেই আছে। আবার মনে হল, যদি বাড়ির সকলকে না জানিয়ে কিছু করতে হয়, বাইরের কোনো লোক দিয়ে কাজটা করানো ভাল নয় কি? আরও ভাবলাম, অন্যদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, বাবা-মাকে না বলেই আমাকে কাজটা করতে হবে নাকি? অনেক রাত পর্যন্ত চিন্তা করেও এসব প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব পেলাম না। শেষ পর্যন্ত নিজেকে বললাম, এ-সব নিয়ে আমার অত মাথা ঘামাবার কী আছে, রাঙাকাকাবাবু সামলাবেন। তার পর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কী করে তাঁকে নিয়ে সকলের অজান্তে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায় তার নানারকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা আরম্ভ করলাম। মেডিকেল কলেজের পাঠ্য, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ইত্যাদি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। (ক্রমশ)

এখন কিনুন! অধিক বাঁচান!

বাঁচান পুরো ২টাকা

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

৫০০ গ্রামের রিফিল প্যাক কিনে

ঠিক তেমন-ই মজাদার,
তেমন-ই তাজা,
তেমন-ই স্বাদেভরা!

রিফিল প্যাক বিশেষভাবে সীল-করা হয়েছে যাতে বোর্নভিটা টাটকা থাকে। এটি খুলে ফেলুন, আর আপনার বোর্নভিটা-র খালি টিনের মধ্যে সবটা ঢেলে রাখুন...বোর্নভিটা-র স্বাভাবিক গুণটি পুরোপুরি বজায় থাকবে।

আপনার পরিবারকে দিন বোর্নভিটা—যার স্বাদ তাদের খুব পছন্দ। শীগগিরি! নিয়ে আসুন — আপনার বিশেষ লাভের ৫০০ গ্রামের রিফিল প্যাক। সেবন করুন—আপনার বোর্নভিটা।

শীগগিরি! স্টক সীমিত!

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর

OBM 7043 BN

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা: গবা পাগলার আসল পরিচয় কী? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ মুখোশ পরে সারকাসে খেলা দেখাত। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পায়। গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। উদ্ধবের পাখি ইতিমধ্যে লুঠ হয়েছে। বাড়ির কর্মচারী নয়নকাজলের ষড়যন্ত্রে রামুও ডাকাতের হাতে। গবার সহায়তায় গোবিন্দ কিন্তু উদ্ধবের বাড়িতে কাজ পেয়েছে। মধ্যরাতে সে আর গবা জঙ্গলে যায়। ডাকাতরা তাদের উপরে আক্রমণ চালায়। পাখি কিন্তু টাকার হদিস এখনো দেয়নি। তারপর....

॥ ২৩ ॥

ঘুম বারবার ভাঙছে রামুর। বড় শীত। বিছানাটাও বড্ড শক্ত। কম্বল কুটকুট করছে। জেগে উঠলে সে জঙ্গলের গভীর নিস্তব্ধতা টের পায় আর গা ছমছম করে ওঠে তার। যে-বাড়িটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, সেটা বিশাল। তবে প্রায় সবটাই ভেঙে পড়ে গেছে। এখানে-সেখানে এক-আধটা ঘর দাঁড়িয়ে আছে কোনোক্রমে, বাদবাকিটা ইঁট আর চুন-সুরকির স্তূপ। ডাকাতরা যথাসম্ভব বাড়িটাকে নিজেদের থাকার মতো করে নিয়েছে। তবে রামু জানে, এটা ওদের স্থায়ী আড্ডা নয়। একসঙ্গে বেশি লোক এখানে থাকে না। প্রায় সব সময়েই আনাগোনা করে।

ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সে-দরজাও পেল্লায় ভারী কাঠের। ঘরখানাও খুবই বড়সড়। মেঝেয় আর দেয়ালে পঙ্খের কাজ করা। তবে সবই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মেঝেয় ফাটল, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। দিনের বেলা ঘরটা খুব ভাল করে দেখে নিয়েছে রামু। পালানোর কোনো পথ নেই। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? চারদিকে জঙ্গল। ডাকাতরা চারদিকে নজর রাখছে।

ঘুম ভেঙে অন্ধকারে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল রামু। শীতে একটু থরথরানি উঠছে শরীরে। কম্বলটা ভাল করে মুড়ি দিয়েও শীত যাচ্ছে না।

হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হল। খুব মৃদু টোকা দেওয়ার মতো শব্দ। রামু কান খাড়া করল। না, ভুল নয়। আবার গোটা দুই টোকা পড়ল।

স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই রামু বুঝল, এই টোকা ডাকাতদের নয়। অন্য কোনো কাণ্ড। বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজার কাছটায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে রইল সে চুপচাপ। খানিকক্ষণ বাদে একটু জোরে টোকা দেওয়ার শব্দ। কে যেন চাপা গলায় ডাকল, "রামু!"

গলাটা চিনল রামু। বিশ্বাসঘাতক নয়নদা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হলেও এই শত্রুপুরীতে নয়নকাজলই তার একমাত্র চেনা লোক। এমনিতে একসময়ে নয়নদা রামুকে ভালও বাসত খুব। পেয়ারার ডাল কেটে গুলতি বানিয়ে দিয়েছে, চাবি-পটকা বানাতে শিখিয়েছে, তার টাইফয়েডের সময় ওই নয়নকাজলই লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে সন্দেশ এনে খাইয়েছে।

রামু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজার কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কে, নয়নদা?"

"হ্যাঁ। পাহারাদারটা একটু তফাতে গেছে। বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছে। সেই ফাঁকে এলাম।"

"কী চাও?"

"শোনো, এই দরজায় বাঁ দিকের পাল্লায় একটা ফোকর আছে। এমনিতে বোঝা যায় না। হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজলে একটা ছোট্ট আলপিনের ডগার মতো জিনিস পাবে। সেটা টানলেই গোলমতো একটা ঢাকনা খোলা যায়।"

"তা দিয়ে বেরোতে পারব?"

"না। বেরোনোর কথা এখন ভেবো না।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

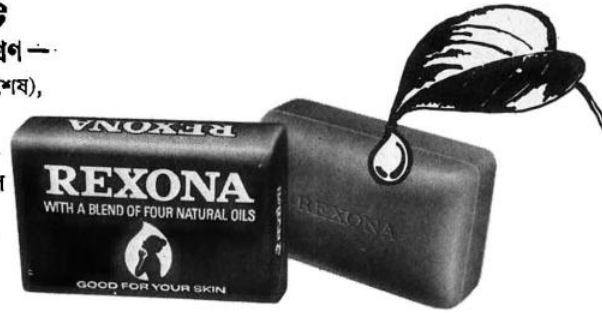

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

এরা অত কাঁচা ছেলে নয়।"

"তাহলে ফোকর দিয়ে কী হবে?"

"তোমার জন্য এক গেলাস দুধ এনেছি।"

"তুমি তো জানোই দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না।"

"সে জানি। কিন্তু এদের দেওয়া খাবার যে তোমার মুখে রুচছে না, তাও তো দেখছি। এরকম আধপেটা খেয়ে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে যে। আর এ ট্যালটেলে দুধ নয়। একদম ক্ষীর-করা দুধ, সরে ভর্তি।"

রামু দরজা হাতড়ে ফোকরটা খুলতে পারল। নয়নদার দেওয়া দুধটা হাত বাড়িয়ে নিলও। মুখে দিয়ে দেখল সত্যিই চমৎকার ক্ষীরের গন্ধ। পুরু সর।

"কী, ভাল?"

"ভাল। কিন্তু তুমি তো এদের দলে। তবে আমার জন্য ভাবছ কেন?"

নয়নকাজল একটু চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "কপালের ফের রে ভাই। লোভে পড়ে এদের দলে ভিড়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি প্রাণসংশয়।"

"তার মানে?"

"মানে এরা আমাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না। তোমার মতো আমাকে ঘরে আটকে রাখেনি বটে, কিন্তু এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোরও উপায় নেই। সব গাঁয়ে-গঞ্জে এদের লোক আছে। যেখানে যাব, সেখানেই গিয়ে খুন করে আসবে।"

রামু বলল, "এরা কি মাফিয়াদের মতো?"

"কে জানে বাপু কাদের মতো। তবে বিরাট দল। শুনেছি জেলখানায়ও নাকি এদের চর আছে। এদের কোনো লোককে পুলিশে ধরলে সে তিনদিনের মধ্যে জেল ভেঙে পালিয়ে আসে।"

"কিন্তু তোমাকে খুন করবে কেন?"

"সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল। একবার এদের দলে ভিড়লে তার আর ছাড়ান-কাটান নেই। তাকে আর এরা কিছুতেই ফিরে যেতে দেয় না। সে ছিল একরকম। কিন্তু ওদিকে আমাকে ডাকাত বলেও স্বীকার করছে না। কোনো বখরা দেবে না, মাইনে দেবে না,

ফরহ্যান্স— দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেস্ট

দাঁত সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাড়ি মজবুত করতে সাহায্য করে

মাড়ির গোলমাল হলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, দাঁত ঠিক মত সাফ না করলে প্লাক নামে জীবাণুর যে পাতলা পর্দা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে, তা জমে ওঠে। এই প্লাক দন্তমলে পরিণত হয়ে মাড়ি দুর্বল ক'রে ঠেলে দেয়, ফলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। মাড়ির গোলমাল সাধারণ স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার অদ্বিতীয় ফরমুলা আপনার মাড়ি মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। কাজেই, আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

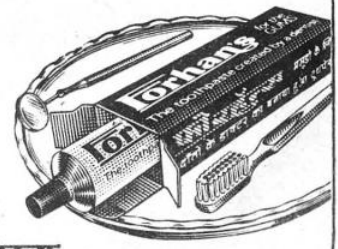

ফরহ্যান্স — মাড়ির জন্যে

Regd. T.M: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

251F-172 BEN

চাকরের মতো খাটাচ্ছে।"

"তা তুমি এখন কী করতে চাও?"

নয়নকাজল করুণ স্বরে বলল, "এ আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রে ভাই। তাই ভাবছি আমার যা গতি হওয়ার হবে। খামোখা তুমি কষ্ট পাবে কেন? ঠিক করেছি, তোমাকে সুযোগ পেলেই পালানোর পথ করে দেব।"

"পারবে?"

"চেষ্টা তো করব। মুশকিল হয়েছে পাখিটাকে নিয়ে।

"কী মুশকিল?"

"পাখিটা আসল কথা বলতে চাইছে না। সাতনা তোমাকে বলেছে, পাখিটার পেট থেকে কথা বের করতে না পারলে মেরে ফেলবে। আমি জানি, তুমি তা পারবে না। আর সাতনা সত্যিই তোমাকে খুন করবে।"

"ঐ বিশাল চেহারার লোকটার নাম কি সাতনা?"

"হ্যাঁ। ওর দয়ামায়া বলতে কিছু নেই।"

"ও কি দলের সর্দার?"

"আরে না। দলের সর্দার কে, তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। মস্ত দল, চারদিকে অনেক ডালপালা ছড়ানো।"

"আমার বাবাকে একটা খবর দিতে পারো না নয়নদা?"

"খবর দেওয়ার দরকার নেই। খবর পেলে তোমার বাবা তোমাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন। তাতে তোমার বিপদ বাড়বে।"

"অন্তত গবাদাকে যদি একটা খবর দিতে পারো!"

"গবা পাগলা! সে খবর পেয়ে গেছে। একটু আগে জঙ্গলে একটা লোক গান গাইছিল শুনলে না?"

"না তো!"

"আমি শুনেছি। গবারই গলা। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। শুধু মনে রেখো, আমি আছি। মরলে মরব, কিন্তু ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমার ক্ষতি হতে দেব না। গেলাসটা দাও, এবার যাই।"

গেলাস নিয়ে নয়নকাজল নিঃশব্দে চলে গেল।

দুধটা খাওয়ার পর শীতটা একটু কম লাগতে লাগল রামুর। কুটকুটে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভরা পেটে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলায় দরজা খুলে প্রথম যে ঘরে ঢুকল সে সাতনা।

ক্ষুরধার চোখে রামুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "কাল রাতে গবা পাগলা এখানে হানা দিয়েছিল। কে তাকে এ-জায়গার হদিস দিল জানো?"

"আমি কী করে জানব?" রামু অবাক হয়ে বলে।

"তোমাদের চাকর নয়নকাজলকে কাঁটাওলা বেত দিয়ে মার দেওয়া হচ্ছে এখন। আমাদের মনে হচ্ছে, হদিসটা সে-ই দিয়ে এসেছে।"

রামু একটু কেঁপে উঠল ভয়ে। বলল, "নয়নদা? নয়নদা কী করে খবর দেবে? সেও তো তোমাদের দলে!"

"আমাদের দলে কিনা তা এখনো আমরা জানি না। তোমার বাবার উকিলে বুদ্ধি তো কম নয়। হয়তো ওকে চর করে আমাদের দলে ভিড়িয়েছে। যাকগে, সে-সব করে লাভ হবে না। এখন একটা কথা বলো তো!"

"কী কথা?"

"গোবিন্দ কোথায়?"

"কে গোবিন্দ?"

"গোবিন্দকে তুমি ভালই চেনো। সারকাসের গোবিন্দমাস্টার।"

"সে কোথায়, তা আমি কী করে জানব?"

"আমাদের সন্দেহ, গোবিন্দ তোমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তাকে অন্য কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।"

রামু কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, "তাকে তোমরা খুঁজছ কেন?"

"তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করা দরকার। তাই খুঁজছি।"

"তুমি এরকম নিষ্ঠুর লোক কেন?"

সাতনা কটমট করে রামুর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ যেন কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল তার মুখ। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা আঁট করে বন্ধ করে দিল পাহারাদার।

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

ক্যাম্পার সঙ্গে
আমরা মাতি রঙ্গে
স্বাদে ও আনন্দে!

ক্যাম্পা অরেঞ্জ ফেবার- স্বাদে ও আনন্দে!

OBM/5361

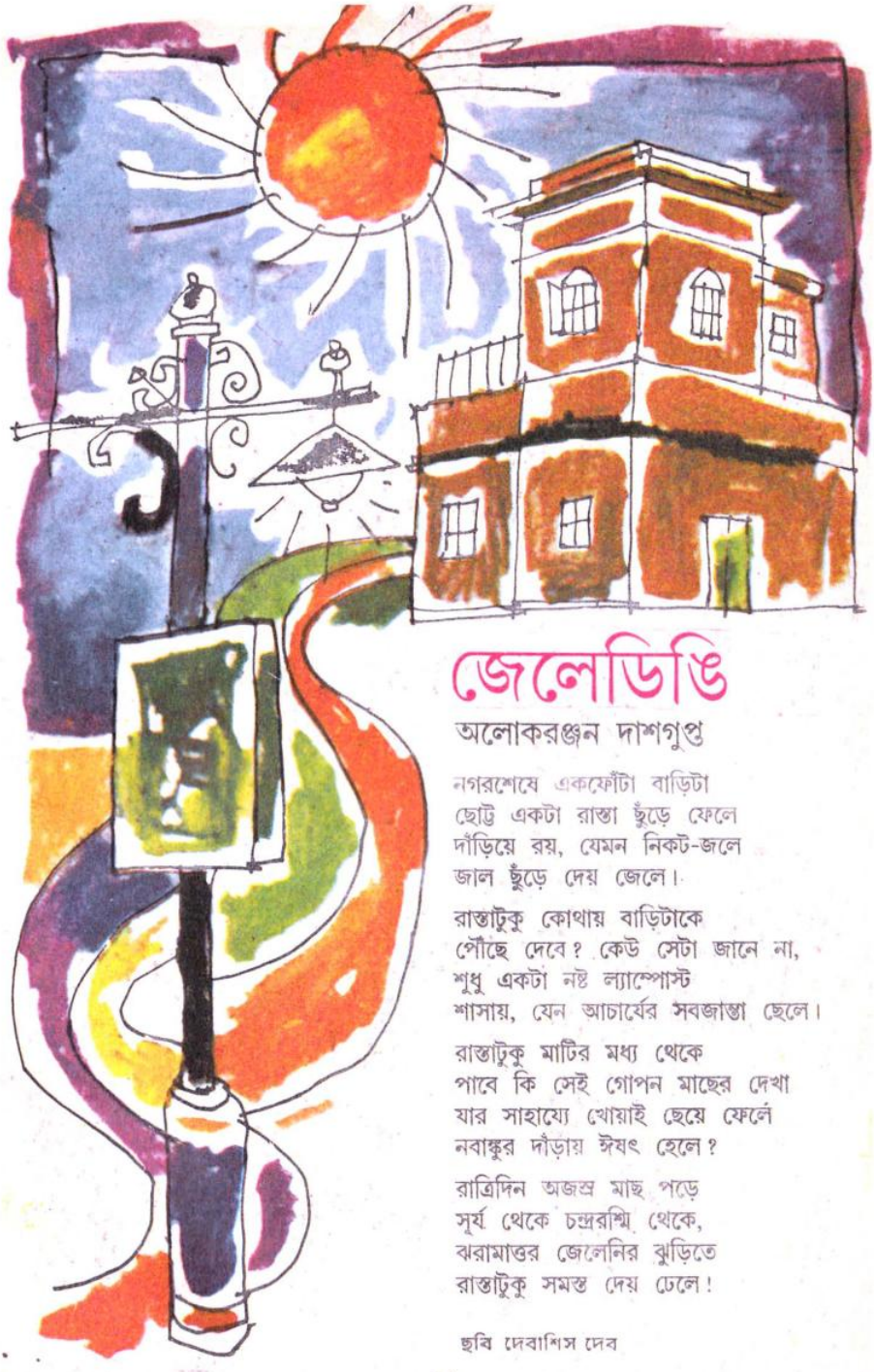

জেলেডিঙি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নগরশেষে একফোঁটা বাড়িটা
ছোট্ট একটা রাস্তা ছুঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়ে রয়, যেমন নিকট-জলে
জাল ছুঁড়ে দেয় জেলে।

রাস্তাটুকু কোথায় বাড়িটাকে
পৌঁছে দেবে? কেউ সেটা জানে না,
শুধু একটা নষ্ট ল্যাম্পোস্ট
শাসায়, যেন আচার্যের সবজান্তা ছেলে।

রাস্তাটুকু মাটির মধ্য থেকে
পাবে কি সেই গোপন মাছের দেখা
যার সাহায্যে খোয়াই ছেয়ে ফেলে
নবাঙ্কুর দাঁড়ায় ঈষৎ হেলে?

রাত্রিদিন অজস্র মাছ পড়ে
সূর্য থেকে চন্দ্ররশ্মি থেকে,
ঝরামাত্তর জেলেনির ঝুড়িতে
রাস্তাটুকু সমস্ত দেয় ঢেলে!

ছবি দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়
দু কোটি টাকাতেও বসরানের কোচ হতে রাজি হয়নি রয়। অথচ, তার স্ত্রী মাঠে এসেছে বসরানের এক রাজকর্মচারীর সঙ্গে। রয় তাই অন্যমনস্ক ...
পেনি ওদের সঙ্গে এল কেন?
রয়, ওদের ছ'নম্বরকে ঠেকাও!
রয়ের দেরি হয়ে গেল!
উঃ!
ভুল করেছি!
ফাউল!
রয় ফাউল করায় সবাই বিস্মিত ...
কী হয়েছে রয়ের?
বল কোথায় যায় দ্যাখো!
ওদিকে যাও, অ্যাণ্ডি!
বল পেয়েই হেড করেছে অ্যাণ্ডি। গোল!
নরবরো গোল শোধ করেছে!
শাবাশ অ্যাণ্ডি!
লফটি রেগে আগুন!
রয়, তুমি বসরানের চাকরিটা নিলেই পারতে!
ঠাট্টা করছ?
ঘরোয়া ঝগড়ার মীমাংসা পরে হবে!
হ্যাঁ, এগোও!
জিওফ আবার বল দিল রয়কে!
রয় এগোচ্ছে ... ব্ল্যাকিও এগোচ্ছে!

হঠাৎ ...
ওকে বসরানে পাঠাও!
ওকে বসরানে পাঠাও!
ব্যাপার কী? ওরা কারা?
নরবরের সমর্থকরা কাগজ পড়েছে!
বসরানে গিয়ে উট চরাও!
হাহাহা!
এ-সব কী?
যাঃ!
রয়ের পা থেকে বল কেড়েছে!
বল চলে এসেছে রোভার্সের দিকে ...
বিপদ ঘটবে!
গোল হবে না!
কী যে বলো!
ডানকান এগিয়ে আসতেই ...
দূর থেকে শট নিয়েছে!
গোল!
ভাবা যায়?
কাণ্ড বটে!
লীগ কাপ থেকে রোভার্সের বিদায়! খেলা শেষ!
যাঃ!
এ কী হল!
রয়!
লাভ নেই, লফটি!
পেনির সঙ্গে ফয়সালা করতে ছুটছে!
খানিক বাদেই ...
আপনার স্বামীর মেজাজ ভাল নেই!
তাতে আমার বয়েই গেল!
বসরানে ওকে যেতেই হবে!
এর পরে আগামী সংখ্যায়
শেষে কি ঘরের শান্তি বজায় রাখতে বসরানে যাবে রয়?

ছেলেকে উদ্ধার করবার পরামর্শ চলছে ... ইউসুফ আমার সামরিক উপদেষ্টা সিগারেট খাবে, টিনটিন ?
ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি না।
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিন শো অশ্বারোহী বাবেলের খোঁজে রওনা হবে। বাবেলকে ধরতে পারলে ...
ফট্!
আসল চুরুট সরিয়ে পটকা-চুরুট রেখে দিয়েছিল আমার ছেলে ! কী মিষ্টি ছেলে !
সিগারেট খাওয়া যাক !
ফট্!
পাজিটা সোব্রেনির জায়গাতেও পটকা-সিগারেট রেখে দিয়েছিল দেখছি !
ঘণ্টা দুয়েক বাদে ...
আশা করছি, বাবেলের হাত থেকে আমার জাদু-সোনা আবদুল্লাকে ওরা উদ্ধার করে আনতে পারবে।
কিন্তু আমার ধারণা, বাবেল তাকে সরায়নি। এটা আর-কারও কাজ।
?
তাহলে বাবেল আমাকে অমন চিঠি লিখল কেন ?
কিন্তু হাতের লেখা যে বাবেলেরই, সে-বিষয়ে কি আপনি ?...
না, তা নই। কিন্তু আগে এ-কথা বলোনি কেন ? তাহলে তো অশ্বারোহীদের আমি পাঠাতুম না।
বলিনি, কারণ ...
আসল অপরাধী জানুক যে, বাবেলকেই আমরা সন্দেহ করছি।
আসল অপরাধী কে, তুমি জানো ?
সম্ভবত জানি। তবে আবদুল্লাকে সে কোথায় লুকিয়েছে, তা জানি না। আবদুল্লার কোনও ছবি আছে ?
ওই তো তার ছবি।
বড় শিল্পীর আঁকা। আবদুল্লার দুষ্টুমিতে ...সে পাগল হয়ে যায়।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
৬	৭	■		■	৮	
■		■				■
৯			■	১০		১১
১২		■	১৩	■	১৪	
	■	১৫			■	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মাছবিশেষ ; আরও দুটো-তিনটে অর্থ হয়। (৩) বাগান। (৫) বাছুর। (৬) সপ্তাহের একটি বার। (৮) শকুনি যে-খেলায় পারদর্শী ছিলেন। (৯) ভণ্ড। (১০) বিশেষ পদ্ধতিতে সেঁকা মাংস। (১২) সুন্দর-এর সঙ্গে কোন্ শব্দ সমাসবদ্ধ হয়? (১৪) ধাতুবিশেষ। (১৫) শিঙা।

উপর-নীচ : দোলের আগের দিন কোন্ উৎসব? (২) ছারপোকা। (৪) জানালা। (৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান হাতিয়ার। (৮) যে-শিষ্য গুরুগৃহে বাস করে। (৯) স্কন্ধকাটা। (১১) ধাতুবিশেষ। (১৩) সোনার প্রাচীন মাপ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পি	স্ত	ল	■	দ	গু	ক
রা	■	শ	■	ম	■	পো
মি	থ্যা	ক	■	ক	বি	তা
ড	■	র	সা	ল	■	ক্ষ
■	দু	■	র	■	জি	■
দু	র্বা	■	না	■	রা	হা
র	সা	■	থ	■	ফ	ল

ধাঁধা

ছোট্‌কাকে কদিন ধরে পদবীতে পেয়েছে। খাবার টেবিলে, চিলেকোঠার আড্ডায়, ছাদের আসরে—সর্বত্রই ছোট্‌কার আলোচনা শেষ হচ্ছে পদবী নিয়ে তর্কাতর্কিতে। বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বন্দ্যঘটি, গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুর, মুখোপাধ্যায় মুখুটি, চাটুতি চট্টোপাধ্যায়— এসব তো আছেই, তার মধ্যেও আবার মাল্লা, শ্যাম, শী, ঝা—এসব নিয়েও নানান গবেষণা।

আমি অবশ্য এ-আলোচনায় সব-কিছুতে খেই রাখতে পারি না। বাবা, সেজদাদু, সীমামাসি দিব্যি তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ছোট্‌কার উৎসাহ হঠাৎ কেন যে বেড়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছি ছোট্‌কার টেবিলে রাখা বইটা দেখে। নতুন কিনেছে ছোট্‌কা, খয়েরি রঙের মলাটের ওপর হলুদ রঙে লেখা নাম—'আমাদের পদবীর ইতিহাস'।

এবারের নতুন ধাঁধার জন্য ছোট্‌কাকে তাগাদা দিতেই ছোট্‌কা বলল, "এবারের ধাঁধার জন্য বিষয় হল, পদবীর সঙ্গে পেশার অমিল। লিখে ফ্যালো চটপট।"

ধাঁধায় পদবী যে থাকবে আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম, কিন্তু পেশার সঙ্গে পদবীর সম্পর্ক কোত্থেকে এল, সেটা বুঝলাম ধাঁধা লিখতে গিয়ে। তোমরা দ্যাখো তো, উত্তর করতে পারো কিনা।

প্রথম ধাঁধা ॥ চার ভদ্রলোকের চার পদবী। মিঃ উকিল, মিঃ ঘটক, মিঃ বণিক, মিঃ পাঠক। কারো পদবীর সঙ্গেই তাঁর পেশার মিল নেই। যেমন মিঃ বণিক ব্যবসা করেন না, মিঃ উকিল করেন না ওকালতি, মিঃ ঘটকের ঘটকালি করা কাজ নয়, মিঃ পাঠক রেডিওতে সংবাদপাঠক নন। অথচ এঁদের চারজনের কারও পেশা ওকালতি, কারও ঘটকালি, কারও কাজ সংবাদপাঠকের, কেউ করেন ব্যবসা।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের পদবী উকিল নয়। মিঃ উকিলের সঙ্গে সংবাদপাঠকের ঝগড়া। মিঃ ঘটক সময় পেলেই ব্যবসায়ীর দোকানে আড্ডা মারেন। মিঃ বণিক আর সংবাদপাঠক অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এ থেকে বলতে পারো, কে কী করেন?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ নীচের শব্দগুলোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে, কী সেটা খুঁজে বার করো তো—

লবঙ্গ, ধনঞ্জয়, ভমণ্ডল, কখন, আইন

তৃতীয় ধাঁধা ॥ আটটা আট দিয়ে হাজার করতে পারো?

গতবারের উত্তর ॥ (১) মাছ ৪ কেজি, মাংস ১৬ কেজি। (২) বোন। (৩) পাটলিপুত্র।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

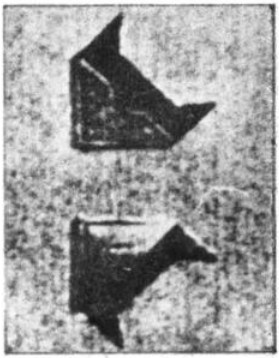

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কাপের ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ বলছ বটে আর কখনো বাজি ধরবে না তুমি, কিন্তু এতদিনের অভ্যাস, পারবে কি ছাড়তে?

উঃ নিশ্চয়ই পারব। এ-ব্যাপারে আমি যে-কোনো বাজি ধরতে রাজি আছি।

প্রঃ ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের দাবাখেলা দেখছে, তো নিজে খেল না কেন?

উঃ ওরে বাবা, অত ধৈর্যই নেই আমার।

প্রঃ কাল যে মাছটা ধরেছ বলছ, তার সাইজটা এক-একজনকে একেকরকম দেখাচ্ছ কেন?

উঃ যে যতটা বিশ্বাস করবে মনে হয়, তাকে ততটাই দেখাই।

প্র আপনার লোহার আলমারি খুলে কেউ চুরি করতে পারবে না—এ-কথা আপনি জোর দিয়ে বলছেন কী করে?

উঃ আলমারির চাবি গিন্নি কোথায় রাখেন নিজেই কখনো খুঁজে পান না, বাইরের লোক কী করে পাবে?

সুসেন

মজার খেলা

'নয়-ছয় করা' নামে একটা কথা চালু আছে বাংলায়। কথাটার মানে হল, এলোমেলো করা বা তছনছ করা। তা, এবার যে-খেলাটা শিখব আমরা, সেটা হল নয়-ছয়ের উলটো। 'ছয়-নয় করা' বরং বলতে পারা যায়।

খেলাটার জন্য চাই ছটা দেশলাইকাঠি। আর চাই এমন একজন বন্ধু যে ভাল অঙ্ক জানে। তুমি করবে কী, বন্ধুর হাতে ছটা দেশলাইকাঠি দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে—এই ছটা কাঠিকে এমনভাবে টেবিলে সাজাও যাতে ছটা কাঠি নটা কাঠি হয়ে যায়। তবে মনে রেখো, কোনও কাঠিকেই কিন্তু ভাঙা চলবে না।

দেখবে, অঙ্ক-জানা বন্ধু রীতিমতো ঘাবড়ে যাবে তোমার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে। ছয়কে নয় করা অত সহজ নাকি?

কিন্তু খেলাটা তো মজার, তাই উত্তরও হবে, অঙ্কের নিয়মের বাইরে, মজাদার প্রথায়।

কী করে হবে ভাবছ? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। খুব সোজা। তুমি প্রথমে নীচের ছবির মতো তিনটে কাঠি সাজাও টেবিলে—

বলো, এই হল ছয়। আর এই হল তিন, বলে পরমুহূর্তে হাতের বাকি তিনটেকে টেবিলের ওপর পরপর সাজিয়ে দাও, নীচের ছবির মতন—

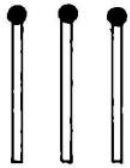

দ্যাখো, 'ছয় নয়' হল কিনা।

মজারু

হাসিখুশি

বুকুন তার পড়ার টেবিলে দোয়াতের কালি উলটে কী যেন বিড়বিড় করে বলছে—দেখে ঠাকুমার কেমন যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে বুকুন, টেবিলে কালি ঢেলেছিস কেন?"

বুকুন : পুজো করছি।

ঠাকুমা : পুজো। কালির পুজো। সে আবার কী!

বুকুন খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "ঠাকুমা, তুমি তো সেদিন বললে তুমি রোজ কালীপুজো করো। কালীই নাকি সব। আমিও তাই কালির পুজো করছি।"

মাস্টারমশাই : তোমাকে দুটো প্রশ্ন করছি বুকুন। ঠিক ঠিক উত্তর দাও তো দেখি। আচ্ছা বলো তো, কোন দেশ প্রথম চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছিল?

বুকুন : আমেরিকা।

মাস্টারমশাই : গুড। এবার বলো তো, চাঁদের দূরত্ব বেশি, না আমেরিকার দূরত্ব বেশি?

বুকুন . আমেরিকার দূরত্বই বেশি। কারণ এখান থেকে চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু আমেরিকা দেখা যায় না।

বুকুনকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে বুকুনের মা মাস্টারমশাইকে বললেন, "দেখুন মাস্টারমশাই, বুকুন এমনিতে খুব লক্ষ্মী ছেলে, মাঝে-মাঝে একটু দুষ্টুমি করে এই যা। কিন্তু ওকে মারধোর করবেন না।"

মাস্টারমশাই একগাল হেসে বললেন, "কিন্তু বুকুন যদি ক্লাসের মধ্যেই দুষ্টুমি করে?"

বুকুনের মা বললেন, "আপনি তখন বরং বুকুনের পাশের ছেলেটিকেই দু'একটা চড়-চাপড় লাগিয়ে দেবেন। তাহলেই বুকুন ভয় পেয়ে যাবে, দুষ্টুমি করবে না।"

ছবি : দেবাশিস দেব

আদিবাসী-শৈলীতে আঁকা ছবি। শেন চেম্বার (বয়স ৮)

মেলভিলে শিশু-উৎসব

অহিভূষণ মালিক

অস্ট্রেলিয়া বলতেই তোমরা ভাবো ডন ব্র্যাডম্যান, গ্রেগ চ্যাপেল, কিম হিউজ, ডেনিস লিলির দেশ। কিন্তু তা ঠিক নয়, সেখানে ছবি-আঁকিয়ে আছে, মূর্তি-গড়িয়ে আছে, গাইয়ে আছে, বাজিয়ে আছে, সব আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ নন। তাঁদের সংখ্যা এখন অবশ্য বেশ কম।

অস্ট্রেলিয়ায় বাসা বেঁধেছে এখন ইউরোপের লোকেরা—জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ, গ্রীক আর রোমানরা। রুশ দেশের মানুষও আছে । শহর গড়ে উঠেছে ইউরোপের মতো বাড়ি-ঘর, রাস্তা, ব্রিজ আর পার্কের বাহারে। সুন্দরভাবে সাজানো মস্ত-মস্ত শহর। পাওয়ারকাটের উৎপাত নেই, রাত্রে রাস্তাঘাট আলোয় আলো হয়ে থাকে। বড় বড় স্কুল, বড় বড় কলেজ। লেখাপড়া. শেখার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। নাচ, গান, ছবি, থিয়েটার—এ-সব সুকুমার কলাবিদ্যা ওখানকার স্কুল-কলেজে শিক্ষার বিষয়। প্রাইমারি স্কুল থেকেই ছেলেমেয়েরা নাচ, গান, ছবি-আঁকা ইত্যাদি শিখতে পারে।

কিছুদিন আগে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলভিলে—মেলভিল অবশ্য সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডেলেড বা পার্থের মতো বড় শহর নয়—এক আন্তর্জাতিক শিশু-উৎসব হয়ে গেছে। উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন তিন মহিলা—ন্যানসি বসওয়েল, দিদ্র পিল এবং ডেনিজ কর্ডিন। এঁরা তিনজনেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। অস্ট্রেলিয়ার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা বেতন পান, তা আমাদের দেশে কলেজের অধ্যক্ষরাও পান কি না সন্দেহ! মাস্টারমশাই আর দিদিমণিদের নিজস্ব গাড়ি আছে। খুব দামি গাড়ি। মারসেডিজ বেন্‌জ কিংবা আল্‌ফা রোমিওর মতো দামি গাড়ি চালাতে এঁদের অনেককেই দেখা যায়। মেলভিলে ১৯৮০-র

'আমাদের শহরতলি'। ড্যানিয়েল লরেন্স (বয়স ১১)

শিশু-উৎসব খুব হৈচৈ করে অনুষ্ঠিত হল।

ভারতের শিশুরাও অংশ নিয়েছিল এই উৎসবে। আটজন ভারতীয় শিশু-শিল্পীর আঁকা আটটি ছবি স্থান পেয়েছিল মেলভিল চিত্র প্রদর্শনীতে। এই আটজনের নাম: সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ দত্ত, অঞ্জনা দাঁ, আনন্দম বসু, সুমা মিত্র, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিলিপি শেঠ এবং কবিরুল গনি। দারুণ প্রশংসা পেয়েছে এদের ছবি। কবিরুল আর তার দাদা সবিরুলের ছবি ১৯৭৯-এ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

'আমাদের ক্লাস-ঘরে'। ক্লেয়ার ওয়ালেস (বয়স ৯)

উপলক্ষে ইউনেস্কো আয়োজিত প্যারিস প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছিল। ওদের শিক্ষক গোপীনাথ দাশ। গ্রামের ছেলে কবিরুল আর সবিরুলের ছবি বার বার যাচ্ছে বিদেশে প্রদর্শিত হতে। ওরাও একদিন বিদেশে পাড়ি দেবে।

মেলভিলের আন্তর্জাতিক শিশু-উৎসবের গোড়ার কথা—ছবি-প্রদর্শনী। পরে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নাচ, গান, থিয়েটার ইত্যাদি কাণ্ডকারখানায় বিরাট ব্যাপার। যে তিন মহিলার নাম করেছি তাঁরা শুরুতে নিজেদের স্কুল-লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের ছবির প্রদর্শনী করতেন। দর্শকের নামগন্ধও ছিল না। হঠাৎ কোনও অভিভাবক উপস্থিত হয়ে পড়লে তাঁর খুব খাতির হত! তারপর তিনজনে মিলে ঠিক করলেন বড় প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। জায়গা ঠিক হল 'গার্ডেন সিটি শপিং সেন্টার'। প্রথমবারেই বেশ জমে উঠল। পরের বার আরও, তারপর আরও, এই ভাবে আজ ওই আর্ট একজিবিশন সত্যিই আন্তর্জাতিক চেহারা লাভ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভারতবর্ষের, ইংল্যাণ্ডের, রাশিয়ার, আরও কত দেশের শিশু-শিল্পীদের কেবল ছবিই নয়, নানারকম হাতের কাজ জমা হয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে এই প্রদর্শনী। এই উৎসবে এসে যোগ দিয়েছে নাচের স্কুল, গানের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও। সারা সপ্তাহ ধরে উৎসব মাতিয়ে রাখে শহরবাসীদের। রঙবেরঙের পোশাক পরে আসে ছোট শিল্পী আর দর্শকরা। গোটা ব্যাপারটা তো তাদেরই। স্থানীয় কুড়িটি স্কুলের এক হাজার ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছে উৎসবে।

বিদেশী ছবির প্রথম প্যাকেট এল নিউগিনি থেকে। কর্তা-গিন্নি শুয়োর খেদিয়ে চলেছেন, খড়ের তৈরি কুঁড়ে-ঘর, পাখির-পালক-পরা আর মুখে চুনকালি মাখা যোদ্ধা—কী মন-মাতানো ছবি! তারপর এল বিদেশী ছবি ভর্তি আরও দশটি প্যাকেট। ভারতীয় শিশুদের আঁকা ছবিও পৌঁছে গেছে। উদ্যোক্তারা প্যাকেট খুলছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছে। রঙবেরঙের মজাদার সব বিষয়বস্তু, নতুন মানুষ, নতুন গাছপালা, নতুন গ্রাম, নতুন কলাকৌশল, নতুন ভাব। একেক দেশের ছবি একেক ভাগে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। ভিনদেশের মানুষ, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন এমন সব বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েরা, কোট প্যাণ্টুলুন আর গাউন-ফ্রক ছেড়ে পোশাক পরে নিয়েছে স্বদেশীয়। খানাপিনাও বদলে গেল কয়েক দিনের জন্যে। শাক-চচ্চড়ি, ডাল, অম্বল, মাছের কালিয়া এসব সেখানে পৌঁছেছিল কি না বলতে পারব না, তবে নানান দেশের জাতীয় রান্নাবান্নার ধুম পড়ে যায়। জাতীয় পোশাক পরে জাতীয় রান্নার স্বাদ ছেলেমেয়েরা নিজেরাই শুধু উপভোগ করেনি, সমাগত অতিথিদেরও সে আনন্দের ভাগ দিয়েছে। আবার নানান দেশের নানান ভাষায় পুতুল-নাচ। কী সব চেহারা, আর কী সব অঙ্গভঙ্গি পুতুলের। নানা ধরনের বাজনার সঙ্গে তারা নাচছে আর গাইছে। সবই প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানা। এত রকম আর্ট শেখানো হয় প্রাইমারি স্কুলে? ভাবতে অবাক লাগে!

এই বিরাট শিশু-উৎসবের কথা অবশ্যই ওই তিন মহিলা—ন্যানসি বসওয়েল, দিদ্র পিল এবং ডেনিজ করডিনের মাথায় আসে।

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন—

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ভাস্কর জাঙিয়া
৪। ফেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

শিরীষ গাছে সূর্য

আমাদের ঘরের পূর্ব দিকে একটি মাঠ আছে। আর মাঠের শেষে আছে একটি শিরীষ গাছ। আমরা কয়েক বন্ধু একদিন মাঠে খেলে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ সোঁ-সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি সূর্যটা শিরীষ গাছে নেমে এসেছে।

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দও হল খুব। তখন আমরা শিরীষ গাছে উঠলাম। তারপর উঠলাম সূর্যের পিঠে। সূর্য ছিল গাঢ় লাল রঙের। সূর্যের এই লাল আলোয় নীচের মাটি, গাছপালা সবই লাল হয়ে গিয়েছিল।

আমরা সূর্যের পিঠে খেললাম অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ একসময় সূর্যটা সোঁ-সোঁ শব্দ করে ওপরে উঠতে লাগল। আমরা চটপট নেমে পড়লাম মাটিতে।

ঈশিতা অধিকারী (বয়স ১০)

আমি মন্ত্রী দেখি

আমাদের বাড়ি বর্ধমানে। শের শাহের তৈরি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর বাড়ি। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে মন্ত্রী যায়। মন্ত্রী যাবার আগে পুলিশের গাড়ি যায়। আমি মন্ত্রী দেখি। মা দুর্গাপুরে একটা স্কুলে চাকরি করেন। আমার বাবা কাজ করেন অফিসে। বাবা-মা মন্ত্রী দেখতে পান না।

শুভজিৎ বসু (বয়স ১০)

পুকুরে অনেক জল

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর
তাতে ভরল একটা পুকুর
পুকুরেতে অনেক জল
করছে তা খুব টলমল
মাছেরা তাতে করছে খেলা
তাই দেখতে গেল বেলা।
পুকুরে আছে শামুক আর গুগলি
বাড়ি আমার বনহুগলি

সুদীপ্ত চক্রবর্তী (বয়স ৭)

নূপুরের কথা

নূপুর আমার প্রিয় বন্ধু। খুব হাসিখুশি সুন্দর মেয়ে। মাথায় একঢাল কালো চুল। কখনও কারও সঙ্গে ওকে ঝগড়া করতে দেখিনি। লেখাপড়াতেও ও বেশ ভাল ছিল।

একদিন হঠাৎ শুনলাম নূপুরের অসুখ করেছে। কয়েক দিন পরে শুনলাম, ওর টাইফয়েড হয়েছে। অবস্থা খারাপ দেখে বাড়ির লোকে ওকে হাসপাতালে দিয়েছে।

খবরটা শুনে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, ও সেরে উঠে আবার স্কুলে আসবে। কিন্তু, ও আর এল না।

কথাকলি মণ্ডল (বয়স ১২)

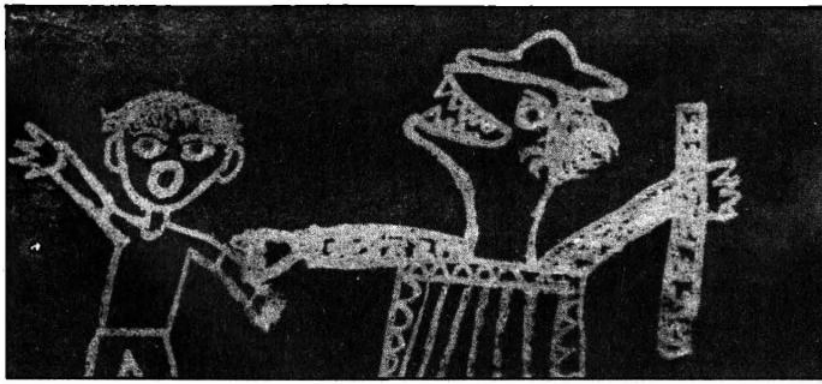

ছবি এঁকেছে তন্ময় সামন্ত (বয়স ৮)

ভূতের ঘুড়ি

খেলনা বিক্রি হয় মেলাতে,
দোকান খুলেছে আজ বেলাতে।
পুরনো এক গাছের গোড়ায়,
ভূত বসে ঐ ঘুড়ি ওড়ায়।

বসুধিতি সরকার (বয়স ৬)

তফাত

ছেলেদের হয় লম্বা দাড়ি
মেয়েদের হয় লম্বা চুল
ছেলেরা করে মারামারি
মেয়েরা করে অঙ্কে ভুল

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

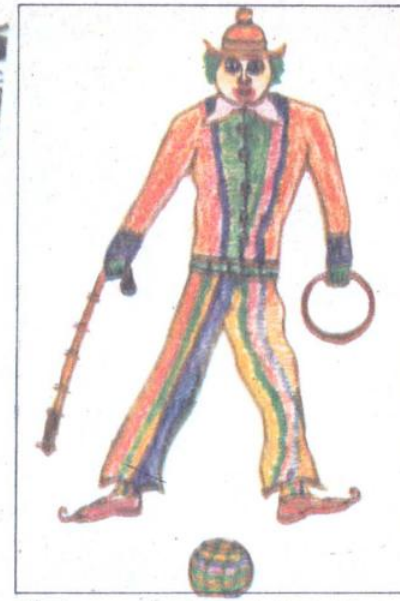

ছবি এঁকেছে ঋদ্ধিমান মুখোপাধ্যায়(বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে আনন্দদীপ সরকার (বয়স ৭)

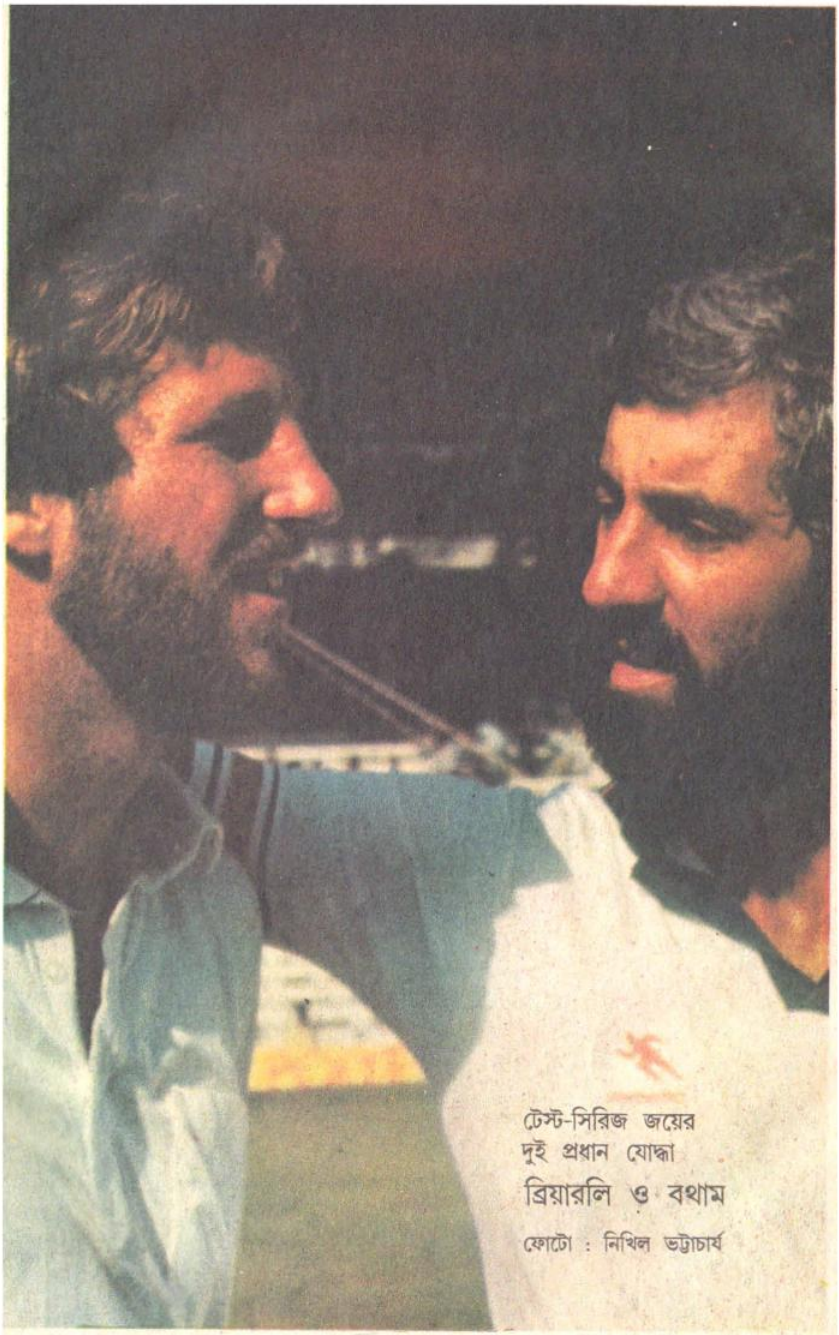

টেস্ট-সিরিজ জয়ের
দুই প্রধান যোদ্ধা
ব্রিয়ারলি ও বথাম

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

অ্যাশেজ ইংল্যাণ্ডেরই

অশোক রায়

প্রথম টেস্ট ট্রেন্ট ব্রিজে। বোধহয় লিলির কথা ভেবেই মেঘলা আকাশের দিকে এক নজর তাকিয়ে টস-জেতা অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক কিম হিউজ বিনা দ্বিধায় ফীলডিং নিলেন। ডেনিস লিলির মতো একজন বোলার ঠিক এমন আবহাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। লিলির পাশে মানানসই হয়ে উঠলেন নবাগত আর একজন পেসার—টেরি অল্‌ডারম্যান। দু-জনের দাপটে ইংল্যাণ্ড ধসে গেল মাত্র ১৮৫ রানে। জবাবে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ দাঁড়াল ১৭৯ রান। ডিলি এবং উইলিস ছটি উইকেট ভাগাভাগি করে নিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ইংল্যাণ্ড শুকনো পাতার মতো ঝরে গেল লিলি, অল্‌ডারম্যানের সামনে মাত্র ১২৫ রানে। ইংল্যাণ্ডের মিডল-অর্ডারকে শক্ত করার জন্যে দীর্ঘদিন পরে বব উলমারকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু দুটি ইনিংসে দুটি 'শূন্য' ছাড়া ইংল্যাণ্ড তাঁর ব্যাটিং থেকে আর কিছুই পেল না! চতুর্থ দিনেই ছ-জনকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়ের জন্যে ১৩১ রান তুলে নিল। 'অ্যাশেজ' লড়াইয়ের শুরু ভালই করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

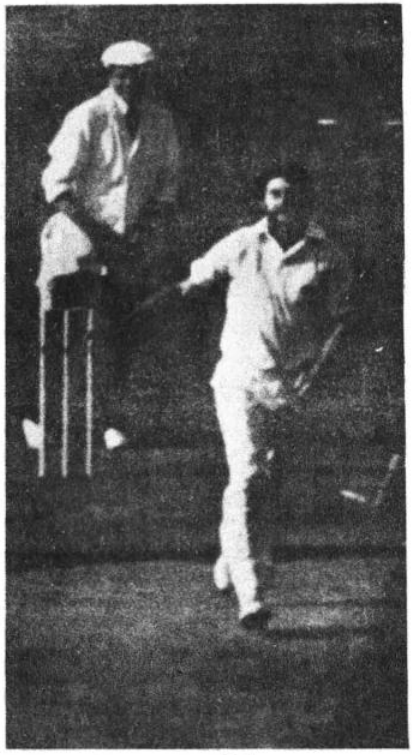

ওল্‌ড বল করছেন (এজবাস্টন)

এই টেস্টে উলমারের ক্যাচটি ধরে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-রক্ষক রডনি মার্শ অ্যালান নটের ২২৪টি ক্যাচের বিশ্ব-রেকর্ডটি ভাঙলেন। এবং ইংলিশ পেসার বব উইলিস অস্ট্রেলীয় ক্যাপ্টেন হিউজকে আউট করে বিশ্বের চর্তুদশ বোলার হিসেবে ২০০টি টেস্ট উইকেট লাভ করলেন। লিলি ৮০ রানে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যান-অব-দি-ম্যাচ হলেও ন'টি উইকেট নিয়ে অলডারম্যান প্রায় সমান কৃতিত্বের অংশীদার হয়ে রইলেন।

লর্ডস, দ্বিতীয় টেস্ট

এবারেও টস জিতে হিউজ ফীলডিং নিলেন সম্ভবত ইংল্যাণ্ডকে বাড়তি কিছুটা চাপের মধ্যে রাখার জন্যে। তবে ইংল্যাণ্ড পরিচ্ছন্নভাবেই ৩১১ রানে ইনিংস শেষ করল মূলত উইলি, গ্যাটিং এবং গুচের সফল ব্যাটিংয়ের দৌলতে। লিলি বা অলডারম্যান নয়, জীবনের দ্বিতীয় টেস্টেই দীর্ঘকায় পেস বোলার জিওফ লসন দুরন্ত পেস বোলিংয়ের ঝাপটায় সাত ইংরেজ ব্যাটসম্যানকে সরিয়ে দিলেন মাত্র ৮১ রানের বিনিময়ে। অস্ট্রেলিয়া ৩৪৫ রান করে সমানে সমানে পাল্লা দিল। উইলিস, ডিলির সংগ্রহে জমা পড়ল তিনটি করে উইকেট।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সব চোখ ছিল বয়কটের ওপর। জীবনের শততম টেস্টে বয়কট (৬০) সেঞ্চুরি পেলেন না, একদা যেমন পেয়েছিলেন স্বদেশীয় কলিন কাউড্রে। বাঁ-হাতি স্ট্রোক প্লেয়ার গাওয়ারের ৮৯ রানে নির্ভরতার ছাপ থাকলেও অধিনায়ক বথাম এই টেস্টে 'জোড়া-শূন্যে'র শিকার হলেন। ২৩২ রানে পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া গোড়াতেই চারজনকে হারিয়ে আর ঝুঁকি না নেওয়ায় ম্যাচ ড্র হল।

হেডিংলি, তৃতীয় টেস্ট

প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মাইক ব্রিয়ারলির নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের অবিশ্বাস্য জয়ের কথা তোমরা আনন্দমেলায় পড়েছ। উইলিসের জীবনের সেরা বোলিং (৪৩ রানে ৮ উইকেট) এবং ম্যাচের বিদায়ী অধিনায়ক ইয়ান বথামের (ম্যান্-অব-দি-ম্যাচ) একইসঙ্গে সেঞ্চুরি ও সাতটি উইকেট ইংল্যাণ্ডকে ১৮ রানে জিতিয়ে দিল। সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল ১—১।

এজ্‌বাস্টন, চতুর্থ টেস্ট

ইংল্যাণ্ড প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও অল্‌ডারম্যানের (৪২ রানে ৫ উইকেট) আক্রমণের উর্ধ্বে উঠতে না পেরে হতাশভাবে ইনিংস শেষ করল মাত্র ১৮৯ রানে। জবাবে অস্ট্রেলিয়া বিশাল্ ইনিংস না গড়লেও ২৫৮ রান করে ইংল্যাণ্ডকে চিন্তিত রাখল। স্পিনার এমবুরি চারটি উইকেট পেলেন ৪৩ রানে। ৬৯ রানে পিছিয়ে-থাকা ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসেও সুবিধে করতে পারল না স্পিনার রে ব্রাইটের বলে (৬৮ রানে ৫ উইকেট)। ইংল্যাণ্ড ২১৯ রানে ইনিংস শেষ করল। এবং অস্ট্রেলিয়াকে ১৫১ রান তুলে জেতার সহজতম সুযোগটি হাতে তুলে দিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসটি ছিন্নভিন্ন করে দিলেন ইয়ান বথাম। ১১ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে একটি অকল্পনীয় জয় উপহার দিলেন ইংল্যাণ্ডকে। চতুর্থ টেস্টেও ম্যান- অব্-দি-ম্যাচ হলেন বথাম। ইংল্যাণ্ড সিরিজে এগিয়ে গেল ২—১ ব্যবধানে।

ওল্‌ড্-ট্রাফোর্ড, পঞ্চম টেস্ট

ক্রিস ট্যাভারে এবং নবাগত পল্ অ্যালটের দুটি প্রশংসনীয় ইনিংস সত্ত্বেও টসে জয়ী ইংল্যাণ্ড ২৩১ রানে শেষ হল। লিলি, অল্‌ডারম্যান পেলেন চারটি উইকেট। অ্যাশেজ সিরিজে লিলির ৩১টি উইকেট পাবার নজির ভাঙলেন অল্‌ডারম্যান। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া ১৩০ রানেই শেষ হয়ে গেল মূলত উইলিস এবং বথামের বলে।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ট্যাভারে, নট এবং এমবুরির অর্ধশত রানের ইনিংসকটি চাপা পড়ে গেল বথামের ঝোড়োগতির সেঞ্চুরিতে। ছ'টি 'ছক্কা'সহ মাত্র দু' ঘণ্টায় তাঁর ১১৮ ইংল্যাণ্ডকে শুধু ৪০৪ রানেই পৌঁছে দিল না,

বর্ডারের বাউণ্ডারি (ওল্‌ড ট্রাফোর্ড)

সিরিজে নিশ্চিন্ত করল। অল্‌ডারম্যান যথারীতি পাঁচ উইকেট নিলেন ১০৯ রানে।

সব সম্মান সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়া শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু দুই বাঁ-হাতি ইয়ালোপ এবং বর্ডারের জোড়া - সেঞ্চুরি ইনিংসকে ৪০২ রানে টেনে এনেও কিছু করতে পারল না। অস্ট্রেলিয়া হেরে গেল ১০৩ রানে, সেইসঙ্গে সিরিজও। ফলে ষষ্ঠ টেস্টের আর কোনও গুরুত্বই রইল না। ম্যাচে পাঁচ উইকেট এবং অনবদ্য সেঞ্চুরি ইয়ান বথামকে উপর্যুপরি তৃতীয়বার ম্যান-অব-দি-ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত করল।

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

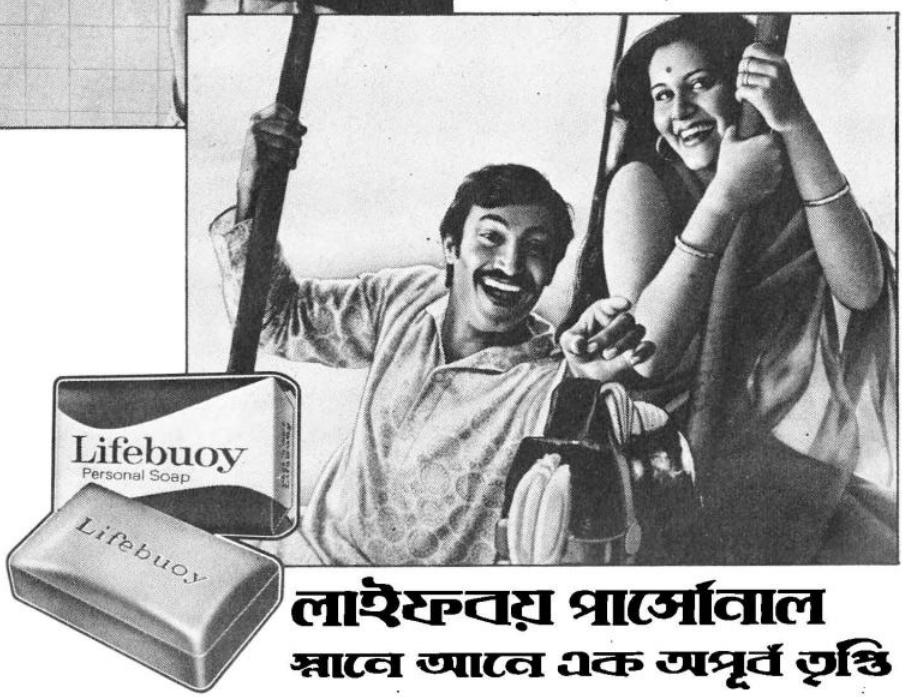

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস-LP.10-1812 BG

জাহিরের কীর্তি

মণীশ মৌলিক

এ-বছর ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে কী কাণ্ডটাই না করলেন বথাম! আর কাউণ্টি ক্রিকেটে কী কাণ্ডটাই না করছেন জাহির! **কাউণ্টি ক্রিকেটের এক মরসুমে দু-হাজার রান সংগ্রহ সহজ নয়। কিন্তু এ-মরসুমে** জাহির আব্বাস যেন অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে দু-হাজার রানের সীমা অতিক্রম করে গেলেন। তোমাদের জন্য এ-লেখা যখন লিখছি তখন পর্যন্ত দু-হাজার রান সংগ্রহ করার ফাঁকে জাহির নটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। কোনোটাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংগ্রহ করা দুর্বল শতরান নয়। রীতিমত দাপটে, বোলারদের ছত্রাখান করে, সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে তোলা সেঞ্চুরি। ক্রিকেটরসিকদের জাহির অবাক করেছেন **এ-মরসুমে দ্রুত** দু-হাজার রান সংগ্রহের দৌড়ে প্রথম হয়ে। খুবই খুশির খবর।

অথচ ভারত-সফরে এসে জাহির আমাদের হতাশ করেছিলেন! আশা করেছিলাম, আটাত্তরে পাকিস্তানে জাহির যে-রকম চোখের ঘুম-কেড়ে-নেওয়া ব্যাটিং করেছিলেন, তেমনি ব্যাটিং ভারতেও করবেন। হায়! তেমন ব্যাটিং তো দূরে থাক, নিজের নামের প্রতিও সুবিচার করতে পারেননি। আর, কলকাতা টেস্টে তো দলেই ছিলেন না। ফৈজলাবাদের প্রথম ইনিংসের জ্বলন্ত ১৭৬, দ্বিতীয় ইনিংসের দুর্দান্ত ৯৬ আর লাহোরে ২৩৫ রানের বিরাট ইনিংসটার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা দেখলাম কলকাতার ক্লাব-হাউসে বসে চশমাধারী এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার খেলা দেখছেন।

নিন্দুকেরা বলেছিল, জাহিরের দৌড় এখানেই শেষ। কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে জাহির আব্বাস প্রচুর রান করেছেন, এখনও করছেন।

সম্প্রতি জাহির আব্বাসের ভয়ানক ব্যাটটা অভাবনীয় সব কাণ্ডকারখানা করেছে। **অভাবনীয়** কাণ্ডকারখানা মানে নতুন-নতুন রেকর্ড। একটি ম্যাচের দুটি ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন চার-চারবার। ১৯৭৬ সালে সারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি ও দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ওই বছরই কেণ্টের বিরুদ্ধে জাহির একই কাণ্ড করেছিলেন। **সাসেক্সের** বিরুদ্ধেও একই ঘটনা। তারপরে এ-বছর সমারসেটের বিপক্ষেও জাহির সেই ঘটনাই আবার ঘটিয়েছেন। অবাক করা ব্যাপার, আটটি ইনিংসেই তিনি অপরাজিত ছিলেন। অনবদ্য একটি রেকর্ড। জাহির এখন যে ফর্মে আছেন, তাতে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। আমরা অপেক্ষায় আছি।।

সঙ্গে
ব্রিটানিয়া মারী!

মাণিক জোড়ঃ চুমুক চুমুক চায়ের সঙ্গে মচমচে
খাবার···ব্রিটানিয়া মারী বড় চমৎকার! পরিপাটির
অতিথি সৎকার···ব্রিটানিয়া মারী করে দেদার!
চায়ের সঙ্গে হালকা খাবার···মারী বিস্কুটের
জুড়ি মেলা ভার!
সব সময় এক প্যাকেট কাছে রাখুন।

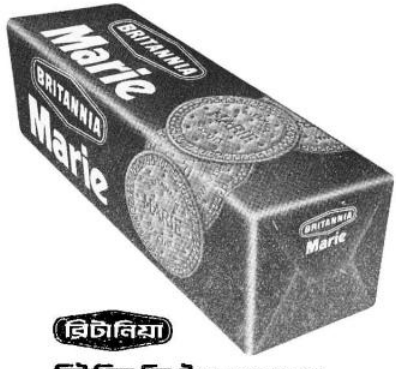

ব্রিটানিয়া

মারী
বিস্কুট
চায়ের সাথী মচমচে বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিনটাস-BIN.MRE.6-18!2 BG

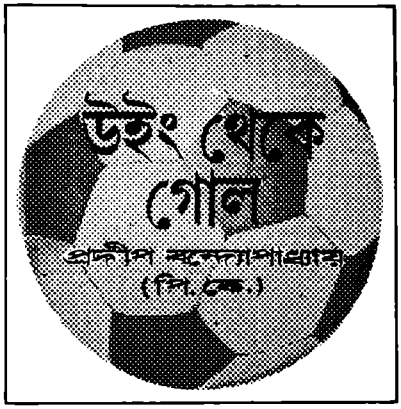

॥ ৩০ ॥

কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপে লীগে ইন্দোনেশিয়ার কাছে হেরে গেলেও আমরা শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে উঠলাম। সেমিফাইনালে খেলতে হল দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ওদের খেলায় শক্তি এবং গতি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, রণকৌশলের দিক দিয়ে ওরা অনেক এগিয়ে।

প্রচণ্ড উৎসাহে আমরা একের পর এক আক্রমণে গেলাম। আর আমাদের মাঝ-মাঠ এবং রক্ষণভাগের আলগা ভাবের সুযোগ নিয়ে পাল্টা আক্রমণে একের পর এক গোল করে গেল দক্ষিণ কোরিয়া। আমাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড দামোদরন এইদিনও গোল করলেন, কিন্তু আমরা হেরে গেলাম ১—৪ গোলে।

এই ম্যাচে পা ফোলা এবং শরীর ব্যথা থাকায় চুনী গোস্বামী খেললেন না। আমারও বুকে যন্ত্রণা, মুখ দিয়ে একবার রক্তও বেরোল! সবাই ঘাবড়ে গেল—টি.বি. নাকি? এন দত্তরায় বললেন, "এখন তো কিছু করার নেই, দেশে ফিরে দেখা যাবে। বেশি চিন্তা কোরো না, খেলে যাও।" বুঝতেই পারছ, খুব মন-মরা অবস্থায় খেললাম।

এবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণের (ব্রোঞ্জ মেডেল) খেলা, আবার ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে। আমরা সেই একই ভুল করে চললাম। হন্যে হয়ে আক্রমণে গেলে যে বিপদ হয়, তা বোঝার মতো ফুটবল-বুদ্ধি আমাদের ছিল না। তাছাড়া ঘন-ঘন ম্যাচ খেলে আমাদের মধ্যে অনেকেই ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছিলেন। শরীর আর চলছিল না। আমাদের এক গোলের জবাবে ইন্দোনেশিয়া তিন গোল করল। ভারতকে চতুর্থ স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিংয়ের কথা না-বললে টোকিও এশিয়ান গেমসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। ৪৬·৬ সেকেণ্ড সময়ে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হলেন মিলখা সিং। ১০·৫ সেকেণ্ড সময়ে ১০০ মিটারে প্রত্যাশা অনুযায়ী বাজি মাত করলেন পাকিস্তানের বিখ্যাত অ্যাথলীট আবদুল খালেক। লড়াই জমল ২০০ মিটার দৌড়ে। কে জিতবেন, 'এশিয়ার দ্রুততম মানুষ' আবদুল খালেক, না 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং? ২০০ মিটারের হিটে মিলখার সময় ছিল ২১·৯ সেকেণ্ড। খালেক একটু এগিয়ে—২১·৮ সেকেণ্ড। অ্যাথলেটিকস-বিশেষজ্ঞরা একথা জানাতেও ভুল করলেন না যে, দুশো মিটার দৌড়ে, চারশোর তুলনায়, একশো মিটার দৌড়ের বিশেষজ্ঞই বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে স্টার্টিং পয়েন্টে এলেন মিলখা সিং এবং আবদুল খালেক। স্টেডিয়ামে পঁচাত্তর হাজার দর্শক, তবু যেন একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। তোমরা হয়তো জানো, অ্যাথলেটিকসে ট্র্যাকে এক পাকের দূরত্ব চারশো মিটার। দুশো মিটার মানে, আধ পাক। প্রথমে বাঁক নিয়ে পরে সমাপ্তি রেখার দিকে সোজা এগোতে হয়।

স্পষ্ট দেখা গেল, চমৎকার 'স্টার্ট' নিয়ে সবার আগে ছিটকে বেরোলেন আবদুল খালেক। অসংখ্য টি·ভি· ক্যামেরা চালু। সকলেরই জানতেন এই দৌড়ের ফয়সালা হবে 'ফোটো ফিনিশ'-এ। মাঝামাঝি জায়গায় মনে হল, মিলখার জেতার কোনও সম্ভাবনাই নেই। 'উড়ন্ত শিখ' নিশ্চয় তা ভাবেননি। ছিলামুক্ত তীরের মতো বেরিয়ে এলেন মিলখা। আমরা চিৎকার করে গেলাম—'কাম অন মিলখা, কাম অন ইণ্ডিয়া।' সমাপ্তিরেখা থেকে নয়-দশ মিটার দূরে মিলখা প্রায় ধরে ফেললেন খালেককে। যখন মাত্র তিন মিটার বাকি, শেষ সামর্থ্যটুকু উজাড় করে মিলখা যেন খালেককে পিছনে ফেলে দিলেন। যেন! আসলে, কে যে আগে সমাপ্তি-রেখার ফিতে ছুঁলেন, খালি চোখে সেটা বোঝা কঠিন ছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই সংশয় কেটে গেল। ঘোষণা করা হল, নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়ে প্রথম হয়েছেন মিলখা সিং। তিনি

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

সময় নিয়েছিলেন মাত্র ২১·৬ সেকেণ্ড।

মনে পড়ল, এই খালেকই একদিন ভারতের মাটিতে ভারতের গর্ব লেভি পিণ্টোকে দুশো মিটার দৌড়ে পরাস্ত করেছিলেন। টোকিও এশিয়ান গেমসের পরের বছর, উনিশশো উনষাটে, পাকিস্তানের মাটিতেও দুশো মিটারে খালেককে পরাজিত করেছিলেন মিলখা সিং। মিলখা সময় নিয়েছিলেন মাত্র ২০·৮ সেকেণ্ড। ভাবতে পারো, দুশো মিটারে তখন বিশ্ব-রেকর্ড সময় ২০·৬ সেকেণ্ড। ভারতের সর্বকালের সেরা অ্যাথলীট মিলখা সিং রোম অলিম্পিকেও আমাদের গর্বিত করেছিলেন।

টোকিও এশিয়ান গেমসের শুরুতে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। গল্পটা তোমাদের শোনানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

ভারতীয় দলনেতা অশ্বিনীকুমার ছিলেন পুলিশের এক বড়কর্তা, তাই মার্চ পাস্টের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। এজন্য বেশ কয়েকদিন আমাদের রীতিমত ট্রেনিং নিতে হল। আজিজ, লতিফ, থঙ্গরাজ আর আমি তৈরিই ছিলাম। তবে কেউ-কেউ খুব অসুবিধায় পড়লেন। অথচ সকলেই চান, মার্চ পাস্টে থাকবেন। ফুটবলারদের মধ্যে নিখিল নন্দী এবং চুনী গোস্বামী অসুবিধায় পড়ছিলেন। একদিন ট্রেনিংয়ের সময় বিরক্ত অশ্বিনীকুমার নিখিলদাকে লাইন থেকে বার করে দিলেন। পরদিন বিশাল দাই-ইচি হোটেলের করিডোরের কার্পেটের ওপর দিয়ে নিখিলদা আর চুনীর এক ঘণ্টাব্যাপী প্র্যাকটিস যদি দেখতে!

মার্চ পাস্টের সময় সাধারণত একই উচ্চতার ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি রাখা হয়। দেখতে ভাল লাগে। বলরাম, মিলখা সিং আর আমার উচ্চতা কাছাকাছি। চুনীর সমান ছিলেন হকির ব্যাক ইয়াকুব।

প্রথমে মেয়েরা, উচ্চতা অনুযায়ী লম্বারা পিছনে। মেয়েদের পরে ছেলেরা। মেয়েদের মধ্যে সবার শেষে থাকতেন শটপাট-বিশেষজ্ঞা দারুণ লম্বা-চওড়া এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। ছেলেদের মধ্যে প্রথম নিখিল নন্দী। ট্রেনিংয়ের সময় একদিন 'হল্ট' (থামো) শুনতে না পেয়ে নিখিলদা ডেভেনপোর্টের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁর ধমক খেয়ে নিখিলদার দৌড় দেখে ডেভেনপোর্টও হেসে ফেললেন।

যাই হোক, শেষ দিন পর্যন্ত, মানে এশিয়ান গেমসের শুরু থেকে মার্চ পাস্টের দিন পর্যন্ত, নিখিলদা, চুনী, ইয়াকুব—সকলেই টিকে থাকলেন।

টোকিওর রাজপথে অটোগ্রাফের খাতায় সই দিচ্ছেন পি. কে.

প্রথমে প্রায় দশ হাজার জাপানি ছেলেমেয়ে দর্শনীয় জিমন্যাসটিকস করল। এতজনকে নিয়ে যে এমন সুসংবদ্ধ প্রদর্শনী করা যায়, তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। জিমন্যাসটিকসের পর ফায়ার-ডান্স হল। তারপর বহু-প্রতীক্ষিত মার্চ পাস্ট। ড্রামের দারুণ

মিলখা সিং

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

আওয়াজের মধ্যেই আমরা লাইনে দাঁড়ালাম। অশ্বিনীকুমার শেষবারের মতো সবকিছু দেখে-নেওয়া শুরু করলেন।

মার্চ পাস্টে সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন ইয়াকুব। উচ্চতা এক হওয়ায় চুনীকে ট্রেনিংয়ের সময় প্রায়-দিনই ইয়াকুবের পাশেই দাঁড়াতে হত। কিন্তু ইয়াকুবের দাঁড়ানোও এমন ছিল যে, যখন-তখন ওঁর বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা। চুনী তাই আসল দিনে ইয়াকুবের পাশে দাঁড়াতে চাননি। কিন্তু চুনী যেখানেই যান, ইয়াকুব পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সে এক মজার দৃশ্য। চুনী একের পর এক জায়গা পাল্টাচ্ছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছেন নাছোড়বান্দা ইয়াকুব। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে চুনী ইয়াকুবের পাশেই দাঁড়ালেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। অশ্বিনীকুমার ইয়াকুবের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, "না, না, তোমাকে দিয়ে হবে না, তুমি বাদ!" আর তারপর, চুনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমিও বাদ!"

চোখের জল চেপে রেখে চুনী ক্যামেরা হাতে তুলে নিলেন, মার্চ পাস্টের ছবি তুলে রাখার জন্য!

মার্চ পাস্টের পর হোটেলে ফেরার সময় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট লাক্সারি বাসের এক কোণে বসে ছিলেন মন-মরা চুনী গোস্বামী। ইয়াকুব বেছে বেছে চুনীর পাশেই গিয়ে বসলেন। আর যায় কোথায়! এতক্ষণের চেপে-রাখা কষ্ট আর রাগ যেন ফেটে বেরিয়ে এল। "গেট আউট!" ইয়াকুব হাত পা নেড়ে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন "ব্যাড লাক!" কিন্তু এসব কথা শোনার মতো মনের অবস্থা তখন চুনীর ছিল না।

তখন চুনীর বয়স অল্প। তাই এই ছোট্ট ঘটনাতেও কষ্ট পেয়েছিলেন। পরে অলিম্পিকের আসরেও মার্চ পাস্ট করেছেন চুনী। বাষট্টিতে, পরের এশিয়ান গেমসে ছিলেন স্বর্ণজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক।

ইয়াকুব চমৎকার সাইড ব্যাক ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় হকি দলের প্রথম এগারোজনের মধ্যে তাঁর জায়গা একদিনও হয়নি। দারুণ খেলতেন, তবু যে কেন তাঁকে বসিয়ে রাখা হত, জানি না। একদিন মনের দুঃখে খুব কেঁদেছিলেন ইয়াকুব। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বলতে পারো প্রদীপ, আমি টেকিওতে কেন এসেছি?" (ক্রমশ)

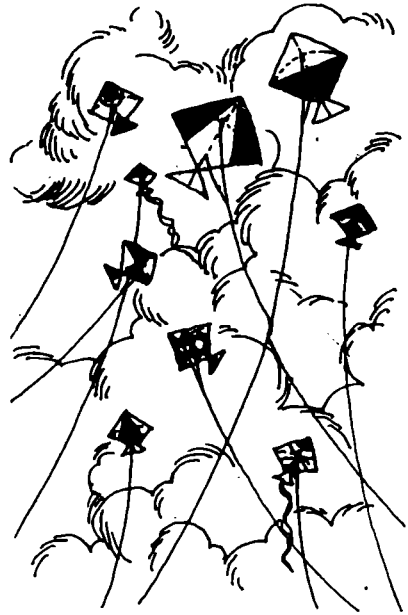

পড়ব কখন

ধীরেন করগুপ্ত

সকালবেলা পড়তে গেলে
চারদিকে হইচই,
সন্ধে হলেই হাই ওঠে যে
পড়ব কখন বই?
ফি-সোমবার ধরবে মাথা
মঙ্গলবার ম্যাচ
বুধবারে তো মাঞ্জা দিয়ে
খেলব ঘুড়ির প্যাঁচ।
বেস্পতিবার দাবি-দিবস
মিছিল শুক্রবার,
শনিবারে মৎস্যশিকার
যাব নদীর ধার।
পড়ব কখন বলতে পারো?
সময় পাব কই!
রবিবার তো ছুটির মজা
কে ছোঁয় সেদিন বই?

ছবি : রতন সেন

পূর্ণেন্দু পত্রী এবং কলকাতা কাহিনী

পূর্ণেন্দু পত্রী কলকাতা নিয়ে লিখেছেন তিনখানা আশ্চর্য বই। একটিতে তিনি শুনিয়েছেন এই শহর কলকাতার গড়ে ওঠার কাহিনী। নাম, 'কী করে কলকাতা হলো।' আরেকটিতে 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা'য় শুনিয়েছেন কলকাতাকে নিয়ে চলতি বহু ছড়ার পিছনের কাহিনী, গল্পগাথা আর ইতিহাস। তাঁর নতুন বই 'কলকাতার রাজকাহিনী।' পুরনো কলকাতার পাঁচ রাজা এক রাজকুমারকে নিয়ে লেখা এই বইতে পূর্ণেন্দু পত্রী শুনিয়েছেন এঁদের ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী। তাঁর কলমে বাসী ইতিহাস হয়ে ওঠে ফুলের মতো তাজা রূপকথার মতো মিষ্টি। প্রতিটি বইতেই দারুণ দারুণ সব ছবি।

আরো অনেক বই

সত্যজিৎ রায়ের বাদশাহী আংটি ৮·০০ এক ডজন গপ্‌পো ১২·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৮·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৭·০০ সোনার কেল্লা ৭·০০ বাকস-রহস্য ৭·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৭·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৭·০০ আরো একডজন ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৮·০০ ফটিকচাঁদ ১০·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৮·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ হত্যাপুরী ৮·০০ আরো বারো ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

ভিতু ভূত

সমর মিত্র

রোববার ছুটির দিন। নটার মধ্যে পড়াশোনা সাঙ্গ করে রাজা, সোনা আর মানিক পুকুরপাড়ে ঢিল ছুঁড়ে ব্যাঙ মারছিল। ব্যাঙগুলো ভারী চালাক। ঢিল ছোঁড়ামাত্র ওরা টুপ করে জলে ডবে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ রাজার নজরে পড়ল একটা ভাঙা কলসি।

রাজা ওদের ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন। সোনা আর মানিক ওকে ভারী মান্য করে। রাজা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "স্টপ ঢিল ছোঁড়া।"

রাজা এইভাবেই কথা বলে। বলে, "আরে, তোরা তো মোটে ক্লাস থ্রীতে পড়িস। সবটুকু ইংরিজিতে বললে তোরা বুঝবি?"

রাজার কথাতে সোনা আর মানিক ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করে দিল। হাতের ঢিল ফেলে দিয়ে ওরা অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজা তখন ভাঙা কলসির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সোনা আর মানিকও ঝুঁকে পড়ল। রাজা বলল, "হোয়াট ইজ ইট?"

সোনা আর মানিক বলল, "কী এটা রাজাদা?"

রাজা বলল, "ইট ইজ এ ভাঙা কলসি।"

রাজাকে ভারী চিন্তিত দেখাল। সে বলল, "বুঝতে পারলি তোরা ব্যাপারটা?"

সোনা আর মানিক দুজনেই ঘাড় নাড়ল। রাজা কোমরে হাত দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আজ আর্লি মর্নিংয়ে জেলেপাড়ার হরিদার ফিশ ধরতে আসার কথা ছিল। বাড়িতে মাই মাদার বলছিলেন, হরিদা ফিশ ধরতে আসেনি। নাও বুঝতে পারছি, দি কজ অব হরিদার না আসা।"

সোনা আর মানিক বলল, "কী হয়েছে রাজাদা?"

রাজা বলল, "হরি কেস্। বাট ভূতের পাল্লায় পড়ে হি...।"

"তার কী হয়েছে?"

রাজা বলল, "ভূতের পাল্লায় পড়ে হি মারা পড়েছে।"

"মানে?"

"মানে হরিদা নেট ফেলেছিল। ফিশের বদলে উঠল এ কলসি। ভেঙে গেল। বেরিয়ে পড়ল এ ভূত। দি ভূত হরির নেক মুটকে তাকে ফেলে দিল পণ্ডের ওয়াটারে।"

সোনা আর মানিক চেঁচিয়ে উঠল, "বল কী রাজাদা!"

রাজা তখন আবার মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে সে কী একটা দেখল যেন। সোনা আর মানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। রাজা তার কোমর সোজা করল। তারপর মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বলল, "হোয়াট ইজ ইট?"

"কী ওটা?"

"ইট ইজ এ বেলের খোলা।"

"বেলের খোলা?"

"ইয়েস। মানে দি ভূত কলসির ভেতর বসে বেল খেয়েছিল। হি লাইক করত বেল খেতে। তার মানে দি ভূত লং লং এগো থাকত বেলট্রীতে। কলসি থেকে ফ্রী হয়ে নাও হি এগেন ফিরে গেছে দ্যাট বেল ট্রীতে।"

সোনা আর মানিক বলল, "তা হলে?"

রাজা বলল, "ফরওয়ার্ড মার্চ।"

রাজার নেতৃত্বে ওরা চলল রাজাদের বাগানে। সেখানেই রয়েছে একটা কয়েতবেলের গাছ। রাজা দূর থেকে কয়েতবেলের গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "দ্যাট ট্রী।"

ওরা ফরওয়ার্ড মার্চ করে এসে গেল বেলগাছের একেবারে কাছে। রাজা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও কী! গাছের তলায় ঝাঁকড়াচুলো লোকটা কে? রাজা চাপা গলায় বন্ধুদের বলল, "ওই তো সেই ভূতটা! স্টপ।"

লোকটা কিন্তু রাজার গলা শুনতে পেয়ে গেল। সে ওদের দিকে ফিরে বলল, "কী হয়েছে খোকাবাবু? কাকে খুঁজছ?"

রাজা দু'চারবার ঢোঁক গিলে কোনও রকমে বলল, "হরিদাকে। ওর আজ সকালে মাছ ধরতে আসার কথা ছিল কিনা তাই।"

লোকটা বলল, "জেলেপাড়ার হরি তো? আমাদের বাড়ি তো ওদিকেই। এক্ষুনি গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা বাড়ি যাও।"

রাজা আর দাঁড়াল না। "অ্যাবাউট টার্ন" বলতেও ভুলে গেল। পিছু ফিরেই সে দৌড় দিল। সোনা আর মানিকও রাজার পিছু-পিছু ছুটতে লাগল।

বিকেলে রাজা বল খেলতে যাবার তোড়জোড় করছিল। সোনা আর মানিক আগেই রাজাদের বাড়িতে এসে গেছে। এমন সময় রাজাদের বাড়িতে হাজির হল হরি। হরিকে দেখেই ওরা তিনজনে চমকে উঠল। রাজার মায়ের কাছে গিয়ে হরি বলল, "ভোর রাত্তিরে বড্ড জ্বর হয়েছিল মা-ঠাকরুন। তাই মাছ ধরতে আসতে পারিনি। আমাদের পাড়ার ভানু মোড়লের ছেলে বলছিল, রাজাবাবু নাকি আমায় খুঁজছিল।"

রাজা চুপি-চুপি সোনা আর মানিককে বলল, "ওই শোন কী বলছে। হরি বলছে, ওর ফিভার হয়েছিল। ভূতটা কী নটি দেখেছিস। হরিকে সব ফরগেট করিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যি উই থ্রী ভূতের সার্চে গেলাম। তাই ভূতটা ইন ফিয়ার হরিকে বাঁচিয়ে আবার ফিরিয়ে দিল। ভূতেরা যে সো ভিতু হয় তা জানা ছিল না। ছিঃ।"

সোনা আর মানিক বলল, "ছিঃ, ছিঃ।"

রাজা সোনা আর মানিক ফুটবল খেলতে বেরিয়ে গেল।

ছবি দেবাশিস দেব

বিখ্যাত গায়ক এন্‌রিকো ক্যারুসো নিউইয়র্কের মফস্বলের রাস্তা দিয়ে চলেছেন মোটর চালিয়ে, গাড়িটা হঠাৎ গেল বিগড়ে। কাছাকাছি গ্যারাজে গাড়ি সারাতে দিয়ে ক্যারুসো এক খামারবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ করবার সময় নিজের নাম বললেন ক্যারুসো। খামারমালিক আনন্দে লাফিয়ে উঠে অতিথির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আপনার মতো বিখ্যাত ব্যক্তি যে আমার এই নগণ্য খামারবাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন এ আমার স্বপ্নেরও অতীত; আপনি ক্যারুসো! সেই বিখ্যাত পরিব্রাজক রবিনসন ক্যারুসো!"

পুজোর ছুটি

রাখাল বিশ্বাস

বলব মাকে, ডাকছ কাকে, এই আমাকে?
আমার ছুটি আজ যে,
অঙ্ক-কষার ধারছি না ধার, ঘুরব শুধু
পাখির পালকরাজ্যে।
ছুট লাগাব ভূত তাড়াতে আঁধার রাতে,
চড়তে যাব টাইগার,
মাত্রা ছাড়ার যাত্রা করে ভাব দেখাব
পরীক্ষাটাও নাই আর।
রোদ-মাখানো সব্‌জে ঘাসে পার্কে হাসে
চড়ুইভাতির রন্ধন।
মিলব গিয়ে টগবগিয়ে, বকবে না কেউ
নেই কোনো আজ বন্ধন।
মলাট-ঢাকা বইটি রাখা, সাঁতরাব না
সেই মলাটের মধ্যে;
মনরাঙা এক ছুটির ঘোড়া ছুটিয়ে যাব
পুজোর ছুটির পদ্যে॥

ছবি অহিভূষণ মালিক

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধুলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন। লিনটাস-SU-224-1810 BG

সিসের আঙটি

বিমল কর

আগের কথা: শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রাম পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। রহস্যময় সিংহিবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। তার আগে পথের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে শিশির থানায় গিয়েছিল। সিংহিবাবু বলেন, তিনি শত্রু নন। তিনি এও বলেন যে, প্রয়াগ নামে যে-লোক আগে শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে-ই হয়তো ওষুধ মেশাত শিশিরের খাবারের সঙ্গে। ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে বিস্তর টেলিগ্রাম-ফর্মের খোঁজ মিলেছে। প্রায়ই তিনি নাকি কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠান। খবর পাওয়া গেল, তাঁর একটা বাস অ্যাকসিডেন্ট করেছে; এবং সিংহিবাবু তাতে জখম। তারপর....

॥ ২৩ ॥

কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে? সিংহিবাবুরও সেই অবস্থা। ভদ্রলোক যেভাবে পড়েছিলেন, তাতে বড় রকম আঘাত পেতে পারতেন। মাথায় লাগতে পারত, কোমর পিঠ গুঁড়িয়ে যেতে পারত, অন্তত পক্ষে হাত-পা ভাঙতে পারত। একেবারেই তেমন কিছু হল না, কাঁধে আর বাঁ হাতে লাগল। হাসপাতাল সিংহিবাবুকে রাখেনি। তখনকার মতন ওষুধপত্র দিয়ে, বাঁ হাতের কব্জির কাছে ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছেড়ে দিল।

শিশিররা তাই পরের দিন বিকেলেই সিংহিবাবুকে তাঁর বাড়ির সামনে দেখতে পেল। বারান্দায় বসে ছিলেন ভদ্রলোক।

শিশিরের চোখ পড়তেই সে বাবুর হাত টিপে অবাক গলায় বলল, "বাবুদা, সিংহিবাবু!"

বাবু তাকাল। দেখল। বারান্দায় কাঠের চেয়ারে এক রোগামতো ভদ্রলোক বসে আছেন। গায়ে গেঞ্জি।

বাবু কিছু বলার আগেই শিশির বলল, "চলো, খবর নিয়ে আসি।"

রাস্তার ধার ঘেঁষেই সিংহিবাবুর বাড়ি। ফটক খুলে শিশির আর বাবু ভেতরে ঢুকল।

সিংহিবাবু ওদের দেখছিলেন।

কয়েক পা এগিয়ে শিশির সিঁড়ির মুখে এসে বলল, "আপনি ভাল আছেন? কাল রাত্তিরে শুনলাম, আপনার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।"

সিংহিবাবু বিরক্ত হলেন না। বরং ভদ্রভাবে বললেন, "এসো।" বলে বাবুকে দেখালেন চোখের ইশারায়।

"বাবুদা। আমার বন্ধু। কলকাতায় একই পাড়ায় থাকি। বাবুদা দুর্গাপুরে কাজ করে। বেড়াতে এসেছে এখানে।" শিশির বলল।

"ও!" সিংহিবাবু এমন চোখ করে তাকালেন যেন বাবুর পরিচয় তিনি এই প্রথম পেলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, তিনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

শিশির বলল, "কেমন করে অ্যাকসিডেন্ট হল?"

"দরজা খুলে পড়ে গিয়েছিলাম," সিংহিবাবু বললেন। "বোসো তোমরা, একটা কিছু দিতে বলি।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা একটু দাঁড়িয়েই থাকি।"

"না না, তা কেমন করে হয়। দাঁড়াও একটু...।" সিংহিবাবু উঠে ভেতর-ঘরে গেলেন।

শিশির নিচু গলায় বলল, "বাবুদা, যন্ত্রে অন্য রকম সুর বাজছে। একটু নরম-নরম লাগছে।"

"ব্যাপার কী?"

"বুঝতে পারছি না।"

"যদি নরম-নরম লাগে, তাহলে একটু টিপে দ্যাখ্ না—যদি কিছু শোনা যায়।"

"দাঁড়াও, দেখছি।"

বাবু বাড়িটা দেখতে লাগল। আজকাল বিকেল পড়তে-না-পড়তেই অন্ধকার হয়ে আসে। শিশিররা একটু আগেভাগেই

বেরিয়েছিল, তবু বোঝা যাচ্ছে, আর বড়জোর আধ ঘণ্টা, তার পরই গাঢ় অন্ধকার হয়ে যাবে।

সিংহিবাবু এলেন। তাঁর কাজের লোকটা ছোটমতন এক বেঞ্চি নিয়ে পেছন-পেছন এল। পেতে দিল বেঞ্চিটা।

"বোসো," সিংহিবাবু বসতে বললেন।

শিশিররা বসল। বসেই শিশির জিজ্ঞেস করল, "আপনার লেগেছে কোথায়? শুধু হাতে? ভাঙেনি তো?"

সিংহিবাবু বললেন, "ভাঙেনি বোধ হয়। কব্জির কাছটায় মচকে গিয়েছে। তাও কী যন্ত্রণা! কাঁধে লেগেছে। ব্যথা বেশ।"

"কেমন করে হল?"

সিংহিবাবু প্রথমটায় কথার জবাব দিলেন না। কিছু যেন ভাবছিলেন। চোখের দৃষ্টি ফাঁকা-ফাঁকা লাগল সামান্য, তারপর কেমন কঠিন হয়ে এল। একবার শিশিরকে দেখলেন, তারপর বাবুকে। বললেন, "কেমন করে হল—শুনলে কি কিছু বুঝতে পারবে! তবু শোনো—।"

সিংহিবাবু অ্যাকসিডেন্টের বিবরণ দিলেন। তিনি সান্যালমশাইয়ের গাড়ি করে বগোদর গিয়েছিলেন। ফেরার পথে গাড়িটা বাসের সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করে। দোষ গাড়ির ড্রাইভারের। বাসটাকে বাঁকের মাথায় এমন করে ওভারটেক করল যে, বাসের মুখটা লাগল গাড়ির পেছনের দরজায়। সিংহিবাবু তখন পেছনে বসে ছিলেন। অ্যাকসিডেন্টের পর বাঁ দিকের দরজাটা আলগা হয়ে গেল। ঠিকমতন বন্ধ হচ্ছিল না। সান্যালমশাইয়ের ড্রাইভার তখন সিংহিবাবুকে সামনে এসে বসতে বলল। বসলেন সিংহিবাবু। তার পর আবার এক জায়গায় এসে বিশ্রী এক বাঁকের মাথায় তাঁর দরজা খুলে গেল—তিনি পড়ে গেলেন। আর একটু এদিক-ওদিক হলে তিনি মরতেন। কপালজোরে বেঁচে গিয়েছেন।

শিশির বলল, "সত্যিই আপনার ভাগ্যের জোর আছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

সিংহিবাবু চুপ। খানিকটা পরে বললেন, "হ্যাঁ, ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন, কিন্তু আমি নিজেও একটু সাবধানে ছিলাম," বলে বাঁ হাতটা ধীরে-ধীরে বুকের কাছে ওঠালেন। যন্ত্রণার মুখ করলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না, আমার কথা শুনলে না, তা হলে তোমায় সব বলতে পারতাম।"

শিশির অপ্রস্তুত। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। শেষে বলল, "আমি আপনাকে অবিশ্বাস করলাম কোথায়? আপনি ভুল বুঝেছেন।"

"করোনি অবিশ্বাস?"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনোটাই করিনি।"

"তা হলে থানার লোক আসে কেন আমার বাড়িতে?"

"আমি পাঠাইনি। বিশ্বাস করুন।"

"তোমার ওই বন্ধু বংশী পাঠিয়েছিল?"

শিশির দু তরফ বজায় রেখে বলল, "না, বংশীও পাঠায়নি। তবে সে আর আমি থানায় গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম তাও আপনাকে বলেছি। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, একটা লোক আমায় যদি রাস্তায় জখম করার চেষ্টা করে, আমি কী আর করতে পারি! থানায় গিয়ে তো জানাতেই হবে।"

সিংহিবাবু অত সহজে ভোলার মানুষ নয়। বললেন, "তা বলে থানার লোক আমার কাছে আসবে?"

শিশির চুপ করে থাকল। বংশী এই কাঁচা কাজটা না করলেই পারত।

বাবু এতক্ষণ কোনো কথা বলছিল না। সিংহিবাবুকে দেখছিল আর কথা শুনছিল দুজনের। এবার কী ভেবে বলল, "থানার লোকরা বড় উলটোপাল্টা কাজ করে। আমি তো ভাবতেই পারি না, তারা আপনার কাছে কেন আসবে?"

সিংহিবাবু কথাটা শুনলেন, কোনো মূল্যই দিলেন না। শিশিরকে বললেন, "তুমি নিজে এসে ভালই করেছ। নয়তো আমিই তোমার কাছে যেতাম। কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"এখন বলব কিনা ভাবছি—" বলে বাবুর দিকে তাকালেন সিংহিবাবু।

শিশির বুঝল। বলল, "বাবুদা আমার বন্ধু। সবই জানে। আপনি ওর কাছে বলতে পারেন।"

সিংহিবাবু বললেন, "জানি। তবে কথাগুলো অন্য কানে না যাওয়াই ভাল।"

"যাবে না।"

"মুখে বলছ যাবে না, কিন্তু আর-একটু পরে

গিয়েই তো তোমার বন্ধু বংশীকে বলবে।"

শিশির অস্বীকার করতে পারল না। "বংশীকে বললে কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন।"

"ও খুব চতুর। কিন্তু সব জায়গায় তো চালাকি চলে না। তোমার ওই বংশী-বন্ধু ভবতোষ সান্যালের বাড়ি গিয়েছিল কেন?"

শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর সিংহিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর দোকানের ব্যাপারে।"

"না।"

"আমাকে তাই বলেছে।"

"তুমি ভীষণ মিথ্যেবাদী, সত্যি কথা বলতে পারো না?" সিংহিবাবু ধমকে উঠলেন। "আমার কাছে মিথ্যে কথা বোলো না। আমি বারবার তোমায় বলেছি, আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমার শত্রু নই।"

বাবু আড়ালে গা টিপল শিশিরের। বলল, "শিশিরের মাথা গোলমাল হয়ে যায়। ও কিন্তু কোনো দিন আপনাকে শত্রু মনে করে না।"

এবারও বাবুকে উপেক্ষা করে সিংহিবাবু বললেন, "আমি বলছি। কেউ ওকে বলেছে ভবতোষবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে। ও শুনেছে কোনোভাবে। তাই ভবতোষবাবুকে বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিল। তাই না?"

শিশির নিশ্চিন্ত হল। আর যাই হোক, সিংহিবাবু আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। বংশী গিয়েছিল এক মতলব নিয়ে, গিয়ে সে দু-চারটে অন্য ব্যাপার জানতে পেরেছে।

শিশির বলল, "আপনাকে ও দেখেছে ও-বাড়িতে এটা বলেছে। আর কিছু বলেনি।"

"তার বেশি আর কী বলবে! কারও বাড়িতে আসা-যাওয়া করলে, আলাপ থাকলে সেটা কি অন্যায়?"

"না না, তা কেন হবে!"

"তোমার বন্ধুকে সেটা বলে দিও।" বলে সিংহিবাবু একটু থেমে হঠাৎ বললেন, "তুমি ভবতোষবাবুকে চেনো?"

"না।"

"দেখোনি কখনও?"

"না না, দেখিনি।"

"এখানের কথা বলছি না। কলকাতাতেও

দেখোনি?"

শিশির অবাক হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল না। বলল, "আমি ওঁর নামই শুনিনি কোনো দিন?"

সিংহিবাবু যেন একটু হাসলেন। তোমাদের বাড়িতে তোমার বাবার কাছে অনেক মক্কেল যায়। কারা যায় তুমি নিশ্চয় খেয়াল করো না। যদি ভবতোষ গিয়ে থাকেন তুমি নিশ্চয় দেখোনি।"

কথাটা ঠিকই। বাবার কাছে কত মক্কেল আসছে কে তার খেয়াল রাখে। শিশির বলল, "আপনি আমার বাবার কথা জানলেন কেমন করে?"

"জানি," সিংহিবাবু রহস্যের গলায় বললেন, "আমি তোমার—তোমাদের নাড়িনক্ষত্র জানি, শিশির। আমি যত জানি তুমিও তত জানো না। কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না!"

শিশির বিহ্বল হয়ে বাবুর দিকে তাকাল। তারপর সিংহিবাবুকে বলল, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। প্রতিজ্ঞা করলাম।"

সিংহিবাবু একটু চুপচাপ থাকলেন, তারপর বললেন, "শোনো শিশির, আমার অ্যাকসিডেন্ট এমনি হয়নি। আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল ভবতোষ।"

শিশির আর বাবু দুজনেই চমকে উঠল।

সিংহিবাবু বললেন, "আমি তোমায় সব বলব। সব।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুনীল শীল

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
২০০ গ্রাম বিস্কুট নাসমাত্র দাম
বিস্কুটের দোকান
২০০ গ্রাম বিস্কুট নাসমাত্র দাম
বিস্কুটের দোকান
দোকান
COOKIE
আপনার ওজন
বিস্কুট
আপনার ওজন
বিস্কুট
আপনার ওজন
এদের বিস্কুট ওজনে কম!
২০০ গ্রা বিস্কুট নাসমা দাম
বিস্কুটে

এখানেও রবীন্দ্রনাথ !

বাচস্পতি

"হাপনারা সোব সোমোয় হামার বাংলা লিয়ে ঠাট্টা কোরেন কেন বোলেন তো, এ ভণ্টুবাবু!" হিগিনকাকু হঠাৎ যেন হিন্দিভাষী লোক হয়ে গেলেন। সেইরকমই ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলে উঠলেন কথাটা। পরমুহূর্তেই আবার বাঙালি হয়ে ভণ্টুর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বড়দা, ধরো একজন হিন্দিভাষী ভদ্রলোক এই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি তাঁকে কী বলবে?"

বাবা একটু হেসে বললেন, "বলব, কেন ঠাট্টা করি আবার, আপনি যা বলেন তা বাংলা নয় বলে!"

"কেন, ও-কথাটা বাংলা হল না কেন?"

এবার ভণ্টু কথা বলল, "কেন, ঐ যে বলছেন 'হাপনারা' 'হামার'! বলছেন 'সোব' 'কোরেন' 'বোলেন'! ওগুলো বাংলা নাকি?"

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক, ওগুলো বাংলা নয়। বাংলা না-হওয়ার একাধিক কারণের মধ্যে একটা হল ঐ 'ও' লাগানো—'সব' না-বলে 'সোব' (এখানে আবার স্যামবাজারের সসিবাবুর স-টা এসে যায়), 'করেন' 'বলেন' না-বলে 'কোরেন', 'বোলেন'।

বাবা বললেন, "তা উনি বাঙালি নন, এ-ভুল হতেই পারে। আমরাও হিন্দি বলতে অনেকেই বেশ ভুলভাল করি।" বলে কী একটা মনে পড়ে গেল তাঁর, আপনমনে একটু হেসে নিলেন। "বুঝলি হিগিন, আমার মোটা মেসোমশাই একবার বাজার করে রিকশায় উঠতে গিয়ে পা ফসকে ধড়মড় করে পড়ে গিয়েছিলেন। লাগেনি, তাই রিকশওলাটা হাসছিল। মেসোমশায় তিরিক্ষি হয়ে ধমকে বললেন, 'খাড়াকে খাড়াকে দাঁত নিকালকে হাসতা কাহে রে?' তা আমার কথা হল অন্য ভাষার লোক অ-এর জায়গায় ও তো বলবেই, সে তো আমার ভাষাটা তেমন করে জানেই না। কিন্তু আমার মাস্টারমশাই যখন কলেজে বলতেন, 'আহা! রবীন্দ্রনাথের চোণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যখানা কী ওপূর্ব! আর রোক্তকোরোবী নাটক! সেও কি কোম ওদ্ভুত!' তখন ভাবতাম, এঁরা তো বাঙালিই। তবু এ-ভুল করছেন কেন?"

হিগিনকাকু বললেন, "তার একটিই কারণ, তিনি বাঙালি হলেও স্ট্যাণ্ডার্ড বা শিষ্ট চলিত বাংলা জানেন না। তিনি তাঁর নিজের অঞ্চলের বাংলার, অর্থাৎ তাঁর ডায়ালেক্টের উচ্চারণ ছাড়তে পারেননি। পুব-বাংলার কোন্ জেলার লোক তোমার মাস্টারমশাই?"

বাবা বললেন, "ঠিক জানি না। কিন্তু এ থেকে রেহাই পাব কী করে?"

হিগিনকাকু বললেন, "আরে মুশকিল, শৃম্বস্তু, শৃম্বস্তু। তুমি 'ওব্যাহতি' চাও তো এ ভুল থেকে?"

বাবা হেসে বললেন, "না, 'অব্যাহতি' চাই।"

হিগিনকাকু বললেন, "চমৎকার, এই তো ধরে ফেলেছ ব্যাপারটা। এবার 'অ' 'ও' হওয়ার মূল নিয়মটা বলি। একটা শব্দের মধ্যে আগে যদি অ থাকে, পরে থাকে ই বা উ—তাহলে অ-টা ও হয়ে যাবে। যেমন 'নদ' ন্+অ+দ্, কিন্তু নদী (নোদি); অত (অতো), কিন্তু অতি (ওতি)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক নিয়মের সঙ্গে এটাও আমাদের শিখিয়েছেন।

ভণ্টু বলল, "বাব্বা, এখানেও রবীন্দ্রনাথ?"

(ক্রমশ)

চামেলির বন্ধু

প্রসাদ

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের নিয়ে কথা হচ্ছিল। চামেলিই প্রথম কথাটা তুলল। একটু আগে বাবার একজন খুব পুরনো বন্ধু টেলিফোন করেছিলেন।

Chameli: Have you many friends, Daddy?

Father: Not many, Milly. But the few I have are the best I could desire. How many have you?

Chameli: Oh, lots and lots. I love making friends.

Father: What kind of friends do you like having most?

Chambal can seldom remain silent when the subject is his sister's friends.

Chambal: silly little talkative ones, like herself.

ভাইবোনে এইবার বিলক্ষণ গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারত মা-বাবা সেখানে না-থাকলে। আবহাওয়া একটু শান্ত হওয়ার পর:

Father: Tell us about your friends, Milly.

Chameli: There's Kamala. Kamala Purkayastha. Oh, Daddy, please take us to Shillong. Kamala keeps saying it's a lovely place. "Pretty as a picture," she says.

Father: Well, let's keep hoping we'll be able to go there some day. But now I should like to hear more about your friend Kamala. Coming from Shillong, how does she like living in Calcutta? Not very much, I dare say.

Chameli: Oh, no, Daddy, she loves living here. But she's a little home-sick at times.

Mother. You can't help feeling home-sick, I suppose, when your home is in Shillong.

Chambal: You should practise climbing hills before you go to Shillong.

Chameli: And where do I get hills in Calcutta?

Chambal: You can practise by climbing the stairs.

বন্ধুদের কথা পরের বার আরো শুনব। এখন খেয়াল করো:

I love making friends.

What kind of friends do you like having?

Kamala keeps saying it's a lovely place.

Practise climbing hills.

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষ্মীটি.
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
GEMS
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্
ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।
OBM/6641/BN

বাঘা

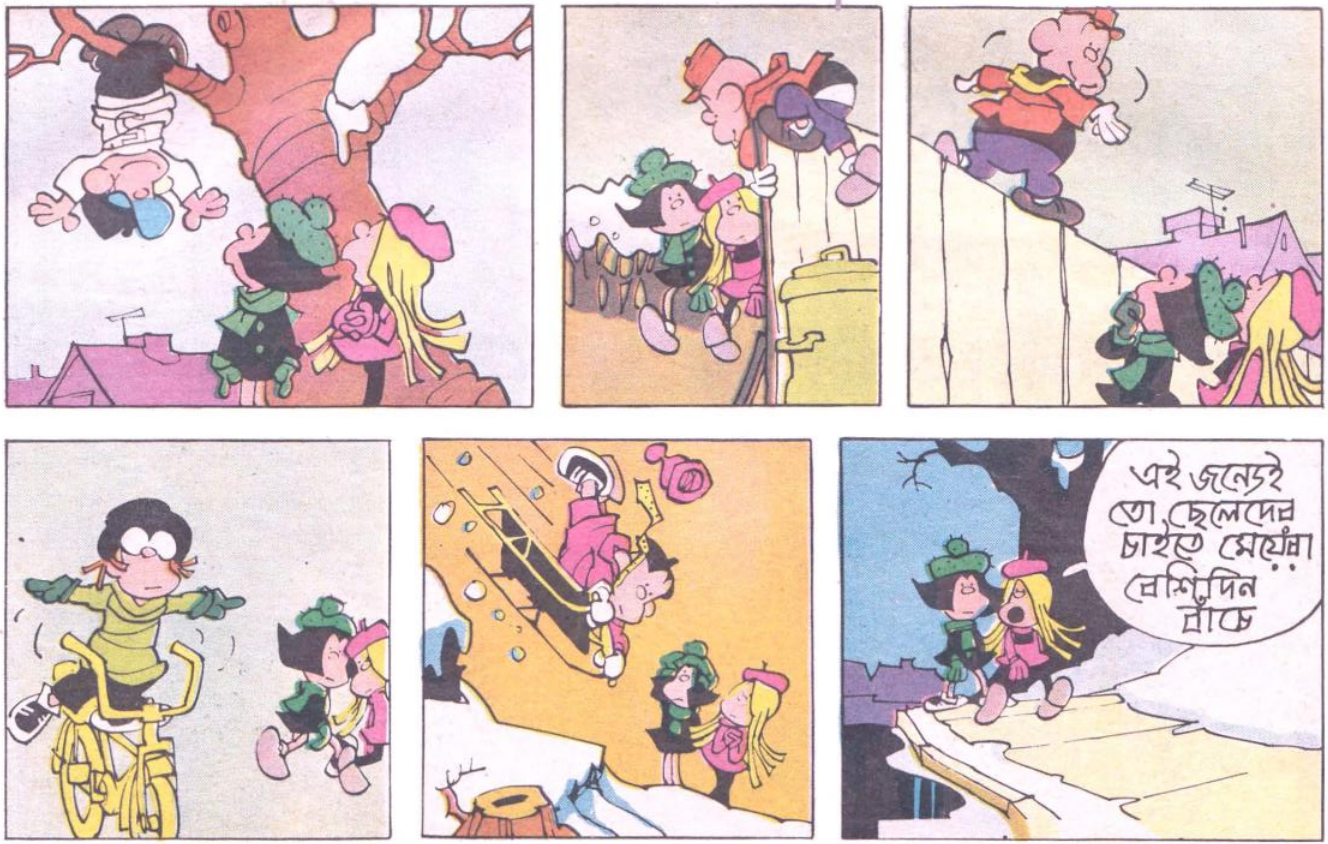

ডিম থেকে পাখি

একটু নজর দিয়ে দেখলেই বুঝবে ডিমের বিশেষ কোনো আকার না পালটেই পাখি তার ভঙ্গি পাচ্ছে। এমন ভাবে চেষ্টা করে দ্যাখো কত রকমের পাখি ধরতে পারো খাতায়।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

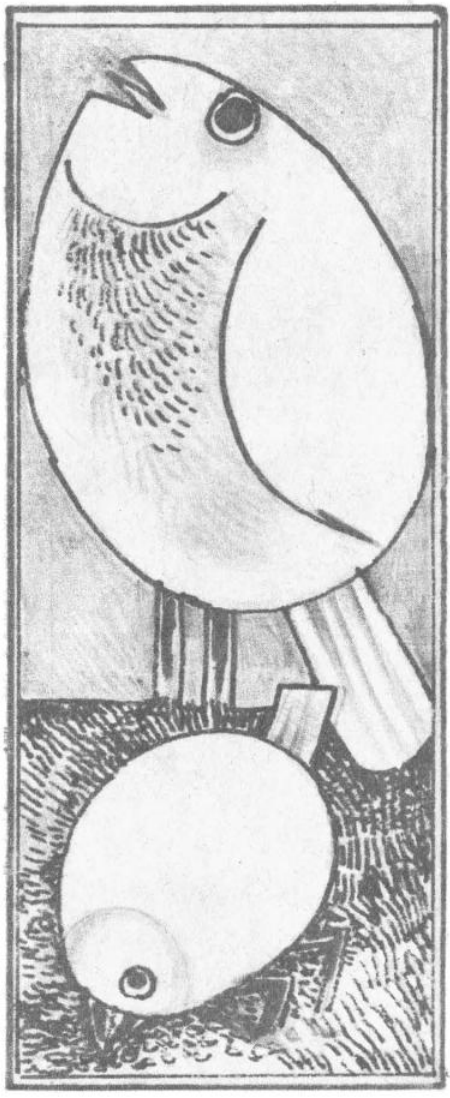

কার্ডবোর্ডের কাজ : টুকিটাকি জিনিস রাখার ট্রে—১

এই কাজের জন্য চৌকো বোর্ড কেটে নাও (১৫"×১০")। নমুনা-মাফিক ভাগ করে নিয়ে কালো অংশটুকু কেটে বাদ দিলে যে চারটি কোণ পাবে (১ নং) তাকে মাঝখান দিয়ে চিরে নাও। ফোঁটা-ফোঁটা দাগ-বরাবর ভাঁজ করলেই কোণ পাবে।

কোণের মুখোমুখি সমান ভাবে পাবে না। বাড়তি কাগজ একে অপরের গায়ে লাগিয়ে দিলেই 'খ' নকশার মতো ট্রে হাতে পাবে। দেওয়ালে টাঙাতে চাও? ফুটো করে নাও পেরেকের মাপমতো।

জেনে রাখো—(১) জোর করে কোনা মেলাতে গেলে বেঁকে যাবে। (২) কোনা মাপে না মিললেই কোথাও মাপের বা কাটার গণ্ডগোল হয়েছে জানবে। ট্রে-র গভীরতা যতটা চাও সেইমতো পাশে জায়গা ছাড়তে ভুলো না।

—কারিগর

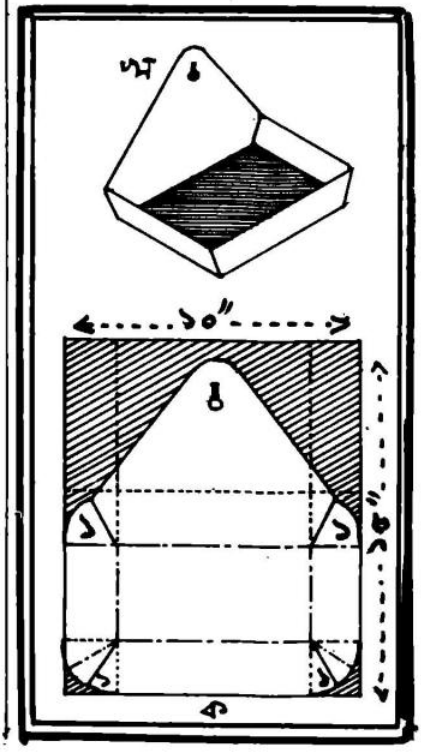

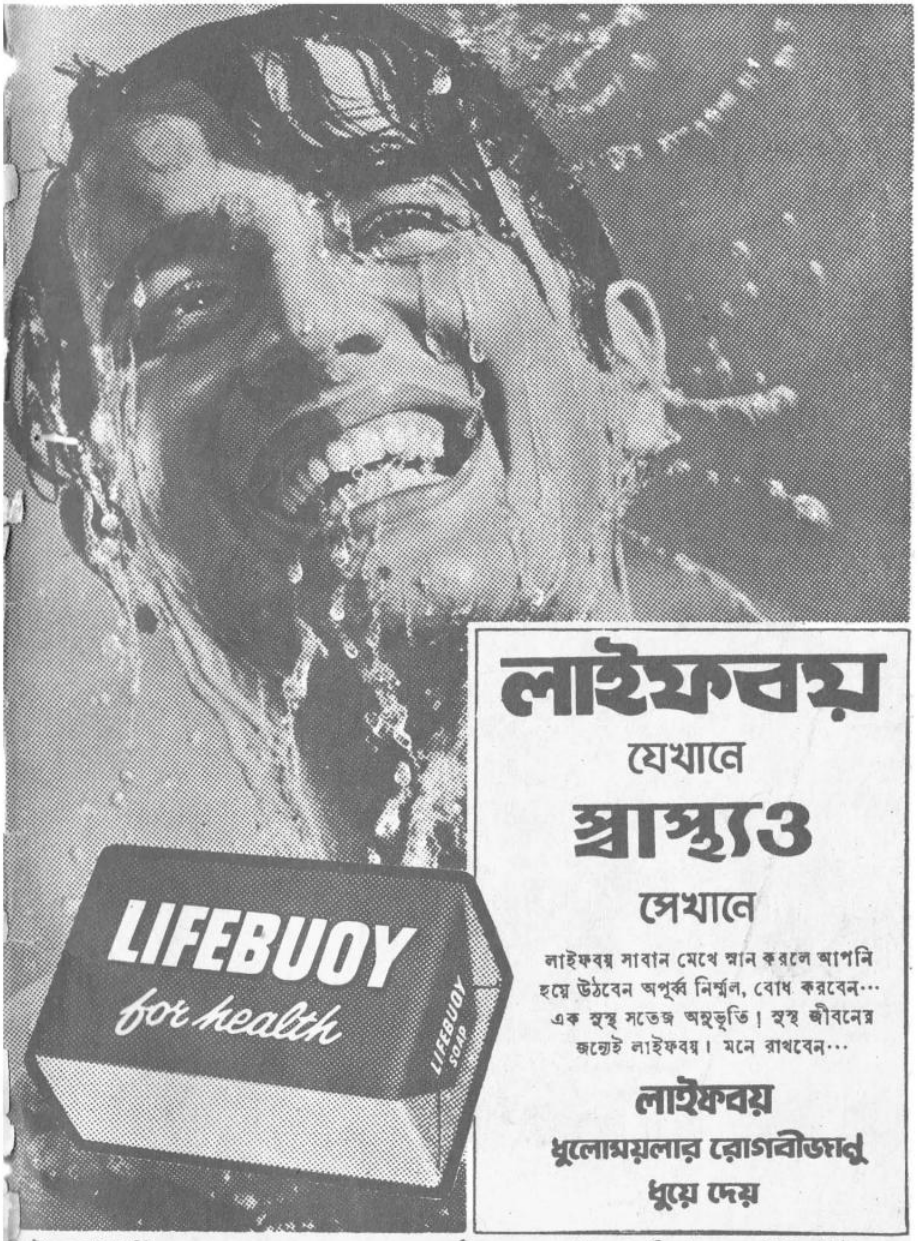

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন··· এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি! সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন···

লাইফবয়

ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

লিনটাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Regd No WB/CC/264.MH-BY-SOUTH 683 ANANDAMELA 7 OCTOBER 1981